# ভয়েস মার্ক

তৃতীয় বর্ষ। তৃতীয় ও চতুর্থ বিশেষ সংখ্যা। জুলাই-অক্টোবর ২০২১। ৩০ টাকা

সম্পাদক
মোঃ আযাদ হোসেন
Web: www.voicemark.in
voicemark19@gmail.com
WhatsApp : 9932837185
azadm.1981@gmail.com
Mob. ৯৭৩৫৮৭৪৩৮৪

গ্রাহক পরিষেবা: রনিক পারভেজ, ৯৩৭৮৪৮০১৯২

প্রচ্ছদঃ হিমাদ্রী শেখর মজুমদার

মূল্য : ত্রিশ টাকা

মোঃ আযাদ হোসেন কর্তৃক ভগবানপুর, আষাঢ়িয়াদহ, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২১৪৮ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক কিস অফসেট প্রেস,

**সম্পাদকীয়**
শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান? ৩
**সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ**
কানহাইয়া কুমারের দলত্যাগ ৪
প্যান্ডোরা পেপারস কেলেঙ্কারি ৬
উপজাতি দিবস এর ফ্যালাসি ৮
পেট্রোল ও ডিজেলের দাম কীভাবে নির্ধারিত হচ্ছে ১০
পেগাসাস কেলেঙ্কারি ১২
তালিবান: রক্ষণকামের নৃশংস হাতিয়ার ১৪
মুসলিম মেয়ে প্রথম ১৬
মহানগর: শঠে শাঠ্যং প্রকল্প ১৭
দাসত্ব আখ্যান: ই-কমার্স ডেলিভারি বয়! ১৮
সিপিএমের আত্মসমীক্ষা ১৯
**আলোকপাত**
**আধিপত্য কাকে বলে** ২১
নিকোলাই
**বোধোদয়** ২২
রনিক পারভেজ
**বাংলাদেশ প্রসঙ্গ** ২৩
ফিরোজ অনীক
**তরুণের আড্ডায়-১** ২৪
আব্দুল মোমিন
**আত্মবিকেন্দ্রিকতায় সৃষ্টি, আত্মকেন্দ্রিকতায় ধ্বংস** ২৫
নিকোলাই
**প্রবন্ধ**
**জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০** ২৭
মিনারুল হক
**মানুষের ধর্ম** ৩০
শ্রীচেতনিক
**স্বাধীনতার ৭৫ বছর** ৩৪
আযাদ রহমান
**লকডাউন ও শিক্ষার হাল** ৪১
নীলকণ্ঠ
**গল্প** দখল কস্তুরী ৪৩
**কবিতা** ৪৫
রঞ্জন পাড়ুই শ্রীচেতনিক আল আমিন ফিরোজ অনীক মীর সাহেব আজিজুল হাকিম পিয়ারুল ভাস্বর রুজ মানিক জ্যোতি দাস
**পুনঃপাঠ**
**ভাব ও কাজ** ৫৫
কাজী নজরুল ইসলাম

## 'অস্তিত্ব' প্রকাশিত গ্রন্থাবলি

| | |
|---|---|
| ১। অস্তিত্বঃ প্রবেশিকা (২১টি প্রবন্ধ) | ১৫০.০০ |
| ২। অস্তিত্ব △ মানুষঃ দেহপূর্ব, দেহান্তপূর্ব এবং ... বর্তন ক্রমঃ এক | ২০০.০০ |
| ৩। অস্তিত্ব △ মানুষঃ দেহপূর্ব, দেহান্তপূর্ব এবং ... বর্তন ক্রমঃ দুই | ২০০.০০ |
| ৪। দেহমনের নিয়ন্ত্রণ এবং ... | ১৩০.০০ |
| ৫। জীবন দিশারী 'অস্তিত্ব' | ৩০.০০ |
| ৬। মেধা প্রতিভা কি ভাগ্য (!) বাচক? কী তার লভ্য প্রযুক্তি? | ১৫০.০০ |
| ৭। দাম্পত্য প্রযৌক্তিক পরিবার সমিতি | ৩০.০০ |
| ৮। বস্তু প্রযুক্তি নির্মাণী 'অস্তিত্ব' | ২৫.০০ |
| ৯। সত্তার অর্গল ভাঙাটাই মনের দরজা খোলার রহস্য | ৪০.০০ |
| ১০। শ্রমমূল্যের শান্তি রথ | ১০০.০০ |

## 'অস্তিত্ব' প্রকাশেয় গ্রন্থাবলি

| | |
|---|---|
| ১। পূর্বপ্রসঙ্গ | ১৬টি কলম |
| ২। সৃষ্টিতত্ত্ব | ২২টি কলম |
| ৩। জীবনতত্ত্ব | ৪৮টি কলম |
| ৪। দেহতত্ত্ব | ৮টি কলম |
| ৫। জীবতত্ত্ব | ১টি কলম |
| ৬। ঋজুতত্ত্ব | ৭৪০টি কলম |
| ৭। সরেজমিন বা স্পটলাইট | একটি সিরিজ |
| ৮। একসোডাস কল্লোল ( কবিতা ) | একটি সিরিজ |
| ৯। অস্তিত্ব △ মানুষঃ দেহপূর্ব, দেহান্ত পূর্ব এবং ... | একটি সিরিজ |

প্রকাশক: গাইডেন্স ফাউন্ডেশন
ফোন: ০৩৩-২২৮০-৬৭০৯/৫৫০৫
১৯৭ পার্কস্ট্রিট, কলকাতা-১৭, (পার্ক সার্কাস ময়দানের পাশে)
যোগাযোগ: ৯৮৩০০৬৯৫২৫
E-mail: emdadul197@gmail.com

সম্পাদকীয়

# শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান?

মন্দিরে বিগ্রহের স্থানচ্যুতি, বিগ্রহের পায়ের কাছে অন্য ধারণার ধর্মগ্রন্থ রাখা, মসজিদে শুকরের মাংস, মন্দিরে গোমাংস ইত্যাদির মাধ্যমে অতি সহজেই বছরের পর বছর পাশাপাশি বাস করা মানুষগুলির মধ্যে হানাহানি, কাটাকাটি লাগিয়ে দেওয়া যায় এই উপমহাদেশে। রয়েছে তার দীর্ঘ মর্মান্তিক ইতিহাস! সম্প্রতি ঘটে যাওয়া প্রতিবেশী বাংলাদেশের নোয়াখালি কাণ্ড যার জাজ্বল্যমান উদাহরণ!

আক্রমণকারী ও আক্রান্তের শ্রেণি পরিচিতি কী? একই। কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য কেবল ধারণা-সংস্কার-আচার আর রীতিতে। ভোগান্তিতে পার্থক্য নেই। বাজার আলাদা নয়। নিত্যানন্দ কম দামে আলু পায় আর আজিজুল বেশি দামে কেনে এমন কোনো বাজার নেই। কিম্বা এমন কোনও পেট্রোল পাম্প কি আছে যেখানে ধর্ম-পরিচিতি অনুযায়ী দাম নেওয়া হয়? নেই। অর্থাৎ কর্পোরেট শোষণের ঘুঁটি হিসেবে এদের ভ্যালু সবসময় এক। কিন্তু এই একত্ব শোষকের কাছে, এদের কাছে না। সেই জন্যই উপমহাদেশের প্রতিটি দেশেই সিংহ ভাগ আর্থসামাজিক সম্পদ কর্পোরেট দানবরা দখল করে রেখেছে খুব সহজেই। নিজের জীবনের ভোগান্তির সাথে সেই সম্পদ কুক্ষি লিংক করতে পারে না কেন নিত্যানন্দ বা আজিজুল ? পারে না। কারণ তাদের পারতে দেওয়া হয় না। পারতে না দেবার জন্য যুগ যুগ ধরে চার্চ-মন্দির-মসজিদে এদের দান খয়রাতির অভাব হয় না। যে করেই হোক বিভাজনী ধারণার আঁতুড় ঘর তাজা টাটকা থাকা দরকার! তার পরেও যদি তাওহিদ (অর্থাৎ মানব জাতির একত্ব) তত্ত্ব জিতে যায় শেষ অস্ত্র তো রয়েইছে, দাঙ্গা!

ধারণার স্বতন্ত্র প্রান্তে থাকলেও সমাজে নির্বিঘ্নে বাস করার জন্য একটি কথা আছে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান! এরা কিন্তু বছরের পর সেটাই করে এসেছে। তবু সেই সহাবস্থানের রেকর্ড ভেঙে যাচ্ছে কেন? কে ভেঙে দিচ্ছে, কী স্বার্থে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তার পরেও প্রশ্ন থেকে যায়। সহাবস্থান সূত্র কি আবহমানের না সাময়িক? ভিন্ন ভিন্ন ধারণা পোষণ করা মানুষদের একে অপরের গলা কাটতে নামালে যাদের লাভ তারা কি বসে থাকে? থাকে না। রুল অর্থাৎ শাসন-শোষণ বজায় রাখতে ডিভাইড জিন্দা রাখা জরুরী। তাই ভিন্ন ভিন্ন ধারণা পোষন করাটাকেই জীবনের সবচেয়ে বড় মাত্রায় দেখাতে হয়। সেজন্য ঐতিহ্য-সংস্কার-রীতি ইত্যাদিকে হামেশাই চাকচিকন করে প্রদর্শন করতে হয়। তার জন্য রয়েছে তাদের প্রপ্যাগাণ্ডা মেশিনারি মিডিয়া! অর্থাৎ সহাবস্থানের সূত্রটি ধারণা নিশ্চিহ্ন করে বিশ্বাস সঞ্চারণী সংস্কৃতির চর্চার শর্তে ভ্যালিড হয়। সেই চর্চা না থাকলেও এর নিদান দেওয়া বাঘ আর গরুকে এক ঘাটে জল খেতে বলার নামান্তর!

স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতবর্ষেও অন্তত ৪০০-৫০০ বছরের এই সহাবস্থান ছিল। কিন্তু তার অন্তরমহলের চোরা স্রোত ব্রিটিশ ঠিকই টের পেয়ে গিয়েছিল। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত করে সে ডিভাইডারের ভূমিকা নিতে শুরু করে। তারপর প্রায় ২০০ বছরের নিশ্চিত সাম্রাজ্য!

স্বাধীনোত্তর বৃহৎ পুঁজি যেমন ছিল, অধুনা কর্পোরেট পুঁজি সেই ডিভাইডারের ভূমিকায়। দাবার বড়ে সেই একই। নিত্যানন্দ আর আজিজুলরা! কর্পোরেটের পুঁজিও একই। ধারণার পার্থক্য! সেই পুঁজিতেই ভারতবর্ষে এখন চণ্ডশক্তির ক্ষমতায়, প্রতিবেশী দেশগুলোতেও তাই!

যে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা পোষণ করাটাই রক্ষের পোয়াবারো করছে, সেই ধারণাগুলি নিশ্চিহ্ন করা প্রয়োজন। তা করতে প্রয়োজন জ্ঞান-বিশ্বাস-সংগ্রামের ত্রিশূল। এই ত্রিশূলী সংস্কৃতির চর্চাতেই নিহিত উপমহাদেশে ধারণার খেলা খেলে যুগে যুগে পগার পার হওয়া রক্ষের জারিজুরি শেষ করার রাজনৈতিক প্রকৌশল ও তার আর্থসামাজিক প্রযোক্তা নেতৃত্বের উত্থান! অর্থাৎ সেই নেতৃত্ব রেডিমেড আকাশ থেকে পড়ে না। সংগ্রামী সংস্কৃতি সাধনার মাধ্যমে আর্থসমাজকে তার জন্ম দিতে হয়। আর্থসমাজ সেই দায়িত্ব নিতে চায় কি?

সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ

# কানহাইয়া কুমারের দলত্যাগ

শহীদ-ই-আজম ভগৎ সিং ভুল করেছিলেন জ্ঞান-পাপ চিনতে। ২১ বছর বয়সে নেহরু-সুভাষ তুলনামূলক আলোচনায় নেহেরুকে তাঁর আন্তর্জাতিকতাবাদী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব বলে মনে হয়েছিল আর সুভাষ বসু হলেন আবেগী বাঙালি এবং দেশীয় (জাতীয়) আদর্শের প্রচারক! তাঁর মত বিচক্ষণ মানুষ জওহরলাল নেহেরুর মার্কসবাদী(?) ইমেজে ভুল করতে পারেন, কানহাইয়া কুমার কোন ছার! (*Scroll.in* এ প্রকাশিত অপূর্বানন্দের আর্টিকল)।

১।। একটি অতি প্রাচীন বাম পার্টির সদস্য ছিলেন কানহাইয়া কুমার। স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেসের প্ল্যাটফর্মে দলটির উপস্থিতি ছিল। কিন্তু বরাবরই সে মস্কো অভিমুখে হাম্বা ডাক দিত। আর দেশে কংগ্রেসের লেজুড় হয়ে থাকা ছাড়া তার কোনোই গতিক ছিলনা। তাই ১৯৩৮-৩৯ এ সুভাষ চন্দ্র বসুকে পিছন থেকে ছুরি মারার কাজটা এই দলের লোকেরাই করেছিল। এদের আইডিয়াল ছিলেন নেহেরু। তিনি যে এলিট কায়দায় মার্কস রপ্ত করেছিলেন সেটাই এই দলটার কাঙ্খিত ছিল।

কিন্তু স্বাধীনোত্তর পর্বে দলটির উত্তর উত্তর নেহেরু প্রীতি ক্রমেই কংগ্রেসের সাথে তার ভেদরেখা মুছে দিচ্ছিল। এর বিরুদ্ধে কিছু তরুণ বিদ্রোহ শুরু করে। যার পরিণামে ১৯৬৪ সালে দলটি ভেঙে CPIM নামে নতুন দল তৈরি হল।

২।। সিপিএম দলটির মধ্যেকার সম্ভাবনা লক্ষ্য করে রক্ষণকামী অপশক্তির সমকালীন এজেন্টরা (চিন-ভারত) দলের অতিবাম অংশটিকে উসকাতে থাকলো। যার পরিণামে দার্জিলিং এর নকশাল বাড়ি এলাকার ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে ১৯৬৭ সালে নতুন দলটি ভেঙে CPIM(L) নামে আরেকটি দল গঠিত হল। 'চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান', 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরো' এই সব কাণ্ড শুরু হয়ে গেল! শহুরে শিক্ষিত যুবকরা যুক্ত হল! গ্রিল, অ্যাডভেঞ্চারিজম! খুন জখম রাহাজানি! ১৯৬৭-১৯৭৭ পর্বের পশ্চিমবঙ্গ সেসব ভয়াবহতার সাক্ষী!

কংগ্রেসের সিদ্ধার্থ শংকর রায় এর মার্কসবাদের প্রতি জাত-শত্রু মনোভাবের বলি হয়ে হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে পুলিশের অত্যাচারে মারা পড়ল! বরানগর সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যে অত্যাচারের সাক্ষী এখনও অনেকেই বেঁচে আছেন। কংগ্রেস নকশালদের মধ্যে কংশাল নামক গুন্ডাদের ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের গোপন খবর নিয়ে নিত! তাদের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে নিরীহ লোকজন খুন করত! কোথাও সিপিএম খবর দিত পুলিশকে! যাই হোক কংগ্রেস দল এবং প্রশাসনের এহেন অত্যাচারের সামাজিক প্রতিক্রিয়ার সুফলটা কিন্তু ঘরে তুলেছিল CPIM। তারাই ক্ষমতা দখল করেছিল। তার পরে কীভাবে তিনটি দশক পার করেছে সে ইতিহাস সকলের জানা।

৩।। সিপিআই এর প্রতি যে অভিযোগ থেকে সিপিএম এর উদ্ভব, ক্রমেই তাদের দশা সেইখানেই গিয়ে ঠেকল। পার্থক্য কেবল এদের লোকবল বেশি। অন্তত তিনটি রাজ্যে তাদের মুখ্যমন্ত্রী! রাজ্যে রাজ্যে ক্ষমতা ভোগ, দিল্লিতে কেন্দ্রবিরোধী আস্ফালন! মুখে মার্কসবাদী কথাবার্তা! জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি, দিল্লি ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করে বেরিয়ে সেই কেন্দ্রেরই আর্থ-রাজনীতিক পলিসির প্রবক্তা হওয়া! ইয়েস এটাই! থেকে থেকে বুড়ো তরফ মস্কোমুখী হাম্বা ডাকলে নিজেরা বেজিংমুখী হাম্বা ডেকে জানান দেওয়া আমরাও আছি!

(এই মস্কো-বেজিং পর্ব চুকে গেলে সিপিআই সিপিএমকে নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে দুই পার্টির সংযুক্তির প্রস্তাব দেয়। বলাবাহুল্য সিপিএম তা প্রত্যাখ্যান করে। CPI এর যুক্তি ছিল যে পয়েন্টে বিরোধ ছিল আজ সিপিএম সেই পয়েন্টে সিপিআই এর অবস্থানেই এসে গেছে। যাই হোক সিপিএম এই প্রস্তাব গ্রহণ করেনি।)

৪।। দলগুলির স্বাভাবিক ঝোঁকে শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়াল তা হল, বিপ্লব পূর্ব দিকে থাকলে এদের অবস্থান পশ্চিমে! কেবল মুখে মারিতং জগৎ! মার্কসবাদের এলিট সুলভ ব্যাখ্যা আর পার্টির ক্ষমতা সবসময় মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কব্জায় রাখা! এই! আজও এদের পার্টি চরিত্রে সেইটাই প্রাধান্যের জায়গায়!

৫।। সেই রকম একটি পার্টির নেতা হিসেবে কানহাইয়া কুমার সিপিআই এ যোগ দিয়েছিল। তখন

অনেকেই বলেছিল, লো ভেরি লো পলিটিক্যাল অ্যাসপিরেশন! কারণ এই পার্টিগুলির ছকবাঁধা কর্মপদ্ধতি আর ইডিওলজির নামে আপেক্ষিক বাস্তবতার বোধহীন কর্মসূচি গ্রহণ দলগঠনের প্রায় ১০০ বছরের পরেও মার্কসিজমকে দেশে প্রভাবী ভূমিকায় আসতে দেয়নি।

৬।। উলটে নেহেরু মার্কা বামপন্থা আর তার বছর বছর যোগানদাতা ইউনিভার্সিটিগুলি সেই মধ্যবিত্ত এলিটিজম দিয়ে ৭৫টি বছর গিলে খেল। শুরু হল মিশ্র অর্থনীতি দিয়ে, শেষ বিশ্বায়নী মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রবক্তা হবার মধ্যে দিয়ে।

বৃহৎ পুঁজির যুগ থেকে কর্পোরেট পুঁজির রমরমা! দারিদ্র্য-বেকারত্ব-ক্ষুধা-ভিক্ষাবৃত্তি-যৌনবৃত্তি একদিকে অন্যদিকে বিলাস বৈভবী জীবন!

এই দুই এর ফাঁক ভরাট করানো হয় সেই এলিটদের দিয়ে 'বচন-কৈবল্য আদর্শ' প্রচার করে! কী, না 'আইডিয়া অব ইন্ডিয়া'! গান্ধী-নেহেরু-প্যাটেল এর সাথে জুড়ে দেওয়া হয় আম্বেদকর-ভগৎ সিং-আসফাক উল্লাহ প্রমুখদের নাম! 'বসুধৈব কুটুম্বাকুম্ব' এর জোরে শোরে প্রচার!

আর্থসমাজে মেজরিটি-মাইনোরিটি সাম্প্রদায়িকতা, জাতপাত, শ্রেণি-বর্ণ, পুঁজির শ্রম-শোষণের অবাধ ক্ষেত্র নিশ্চিত করণ! এইসবে কংগ্রেস নামক দলটির সার্বক্ষণিক পলিসি ও ভাবাদর্শীয় পৃষ্ঠপোষক সিপিআই -সিপিএম! ইয়েস! শুধু ইউপিএ-১ ও ২ জমানায় গৃহীত সরকারি নীতিগুলির দিকে তাকান। তাহলেই বুঝবেন কং-বাম যোগ! বলবেন খারাপ হয়েছিল কি? সেই বিতর্কে যাচ্ছি না। তবে তা যে মার্কস থেকে বহুদূরের ব্যাপার আর তা যে এরাজ্যের পপুলিস্ট নেত্রীর আজকের ডোলের পূর্বসূরী ব্যাপার স্যাপার তাতে কোনো সন্দেহ নেই!

৭।। এই যে অর্থনৈতিক নীতিতে মুক্তবাজার পন্থা আর ভাবাদর্শীয় ক্ষেত্রে সাংবিধানিক আদর্শের বুলির বৈপরীত্য সেই ফাঁক দিয়েই উগ্র হিন্দুত্ববাদী-জাতীয়তাবাদ ধীরে ধীরে মাথা তুলতে তুলতে আজ মহীরুহ হয়েছে। কেন্দ্রীয় ক্ষমতার শিখরে বসে সে সেই 'বচন-কৈবল্য বৈধানিক আদর্শের' বারোটা বাজাচ্ছে! চরম অথরিটারিয়ান থেকে ফ্যাসিবাদী টার্ন তার ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য!

৮।। সেই চণ্ড ক্ষমতার উল্টো পিঠে তাকে পরাজিত করার শক্তি হিসেবে কানহাইয়া জিগনেশ মেবানিরা কংগ্রেসকে বেছে নিলেন। ঘোষিত লক্ষ্য কংগ্রেসকে বাঁচানো অর্থাৎ আইডিয়া অব ইন্ডিয়া বাঁচানো! চিরকাল বাম ( ক্ষমতার উল্টো পিঠ) সেজে না থেকে পাল্টা ক্ষমতায় দেশ পাল্টানো অনেক ভালো, এই তারা মনে করলেন!

৯।। শুধু কি তাই? যে দলগুলোর কাছে জওহরলাল নেহেরু আজও আদর্শ স্বরূপ সেই দলের লোক নেহেরুর দলে যোগ দিলে (কংগ্রেসে) ক্ষতি কী? ক্ষতি নেই। এখন দেখবার বিষয় কানহাইয়া কথিত 'বড় জাহাজ' অর্থাৎ কংগ্রেস তার কথিত 'আইডিয়া অব ইন্ডিয়া' বাঁচাতে পারে কিনা!

১০।। একটি মন্তব্য করার লোভ সামলানো যাচ্ছে না। 'আইডিয়া অব ইন্ডিয়া' বাঁচানোর কথা বলা আর 'ধর্ম' বাঁচানোর কথা বলার মধ্যে একটা মিল আছে না? হ্যাঁ আছে। আসলে 'ধর্ম' যেমন বাঁচানোর কথা না, প্রতিষ্ঠার কথা ঠিক তেমনি কোনো আইডিয়া বাঁচানোর দরকার হয় না। কী দরকার হয়? শ্রম ও মূল্য ভিত্তিক মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হয়। সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই জাতপাতহীন, বর্ণব্রাহ্মণ্য চাতুরীহীন, শ্রেণিহীন, ধর্ম-আফিমহীন, মুক্ত আর্থসমাজ গড়ে উঠতে পারে।

তার ভাবাদর্শীয় ভিত্তি হবে অস্তিত্ব দর্শন ব্যাখ্যাত রামায়ণ ও মহাভারত তত্ত্ব। কারণ রামায়ণ ও মহাভারত তত্ত্ব ছাড়া ভারতবর্ষে মার্কসবাদ প্রযুক্ত হতেই পারেনা! সে অন্য আলোচনা!

কিন্তু সেই আইডিয়া বাঁচানোর কথা বলে কংগ্রেসের হাত শক্ত করতে কানহাইয়া ও জিগনেশ মেবানিরা কংগ্রেসে যোগ দিলেন। তাতে আইডিয়া বাঁচুক না বাঁচুক, কংগ্রেস হয়তো বাঁচতে পারে।

# প্যান্ডোরা পেপারস কেলেঙ্কারি

প্যান্ডোরা পেপারস কেলেঙ্কারিতে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, প্রভাবশালী রাজনীতিক, কর্পোরেট ধনকুবের, বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিখ্যাত ও কুখ্যাত ব্যক্তিরা কী পরিমাণ কালো টাকা গোপন করেছে? সেটি নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তবে সাংবাদিক-বিশেষজ্ঞদের হিসেবে তার পরিমাণ $5.6 ট্রিলিয়ন থেকে $32 ট্রিলিয়ন। হিসেবটি বুঝতে পারছেন? ভারতের অর্থনীতির মোট আয়তন এখনো পাঁচ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়নি। তার অর্ধেক হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সেই লক্ষ্যমাত্রা পাঁচ ট্রিলিয়ন ঘোষণা করেছেন কিছুদিন আগে। নিশ্চয় ভুলে যান নি! এবার হয়তো অনুমান করতে পারছেন গোপন করা কালো টাকার পরিমাণটি কী বৃহৎ!

১।। আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসি স্থিত International Consortium of Investigative Journalists (যার সাথে ১৫০ টি সংবাদ সংস্থা এবং ৬০০ বেশি সাংবাদিক যুক্ত রয়েছেন) ১ কোটি ২০ লক্ষ ডকুমেন্ট সম্বলিত Offshore আর্থিক রেকর্ড বের করেছেন এবং প্রকাশ করে দিয়েছেন। এই তথ্যে ২৯০০০ অফসোর কোম্পানি ও তাদের মালিকানা সংক্রান্ত ডিটেলস রয়েছে। এই কনসর্টিয়ামের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংবাদ সংস্থা হল- বিবিসি, দ্য গার্ডিয়ান, ওয়াশিংটন পোস্ট, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস প্রভৃতি।

২।। ৩০০ এর বেশি ভারতীয় নাম সামনে এসেছে। এর মধ্যে রয়েছে ৬০ জন বিখ্যাত-কুখ্যাত ব্যক্তি ও কোম্পানির নাম। বড় নামগুলি অনিল আম্বানী, শচিন তেন্ডুলকর, নীরব মোদি ও তার বোন পূরবী, কিরণ মজুমদার শ এবং তার স্বামী জন শ, নীরা রাডিয়া, ইকবাল মিরচি, সমীর থাপার, সতীশ শর্মা, জ্যাকি শ্রফ। আদানী ব্রাদার এর আগেই (পানামা পেপারে উল্লিখিত) বিভিআই তে কোম্পানি খুলেছিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বড় নামগুলি হল— রাশিয়ান প্রসিডেন্ট পুটিন, জর্ডানের রাজা, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট, কেনিয়া ও ইকুয়েডর এর প্রেসিডেন্ট, চেক রিপাবলিকের প্রধানমন্ত্রী, প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধামন্ত্রী টনি ব্লেয়ার ও তার স্ত্রী, পাকিস্তানের ইমরান খানের মন্ত্রী সভার কয়েকজন। ৯১ টি দেশের নানান জাতের এভিল/ডেভিল/ইবলিশ/ খবিশ এই তালিকায় রয়েছে।

৩।। এই রেকর্ড থেকে জানা যাচ্ছে রিলায়ান্স এডিএ গ্রুপের চেয়ারম্যান অনীল আম্বানী ও তার আত্মীয়রা কমপক্ষে ১৮ টি এই রকম শেল (Shell) কোম্পানির মালিক। যার অবস্থান ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড এর জার্সিতে।

৪।। কোম্পানি বা ট্রাস্ট তো বৈধ, তাহলে সেগুলি নিয়ে প্রশ্ন কেন?

সঠিক কারণে ট্রাস্ট বা কোম্পানি গঠিত হতে পারে। বেঠিক কারণেও হতে পারে। যেমন এক্ষেত্রে হয়েছে। ক) গোপন উৎস থেকে প্রাপ্ত ধন লুকোনোর জন্য। খ) আয়কর লুকোনোর জন্য এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা থেকে ধন বাঁচাতে। গ) যারা লোন দিয়েছে তাদের থেকে ধন বাঁচাতে। ঘ) এবং এছাড়াও নানান অপরাধকাণ্ডে টাকা ঢালবার জন্য।

প্যান্ডোরা পেপার থেকে জানা যাচ্ছে ধনকুবের, রাজনীতিবিদ, বিখ্যাত-কুখ্যাতরা কীভাবে জটিল বহুস্তরীয় ট্রাস্ট বা কোম্পানি গঠন করেছে ধন গোপন করতে এমন জায়গায় যেখানে তাদের পরিচিতি গোপন থাকবে এবং সেখানের আইনে ট্যাক্স শূন্য অথবা অতি সামান্য। এভাবে ট্রাস্ট বা কোম্পানি গঠনের লক্ষ্যে থাকে ১) ট্যাক্স অথরিটিকে ধোকা দেওয়া

২)বিনিয়োগ, ক্যাশ, শেয়ার হোল্ডার, রিয়েল এস্টেট, আর্ট, বিমান ইত্যাদি উত্তমর্ণদের থেকে ও ট্যাক্স অথরিটির আওতা থেকে বাঁচানো।

যেমন- ১। নীরব মোদি দেশ থেকে পালাবার আগে তার বোন পূরবীকে এই ধরণের ট্রাস্টের কর্তৃত্বে রেখে যায়।

২। অনিল আম্বানী ব্রিটিশ কোর্টে নিজেকে দেওলিয়া ঘোষণা করেছিল। কারণ কোর্ট তাকে $7000 মিলিয়ন চিনের ব্যাঙ্ককে প্রদান করার অর্ডার দিয়েছিল। অথচ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে তার ও তার আত্মীয়দের রয়েছে ১৮ টি শেল কোম্পানি যার মাধ্যমে অপরিমেয় ধন সে কুক্ষি করেছে।

৫।। অফসোর (Offshore) আর শেল কোম্পানি ব্যাপারটি কী?

প্যান্ডোরা পেপারস উদঘাটন করেছে সেই সমস্ত বিদেশী কোম্পানির গোপন নেটওয়ার্ক যার দ্বারা সম্পদ বা অর্থের মালিকানা গোপন করা সম্ভব হয়।

যেমন ধরা যাক, কারুর ব্রিটেনে কোনো প্রপারটি আছে। সেটিকে সরাসরি তার মালিকানায় দেখানো হল না। অন্য দেশে অবস্থিত কোম্পানির মাধ্যমে সেটিকে সেই ব্যক্তি মালিকানায় নিল। এটাই অফসোর। এই

অফসোর টেরিটরি বা দেশ হল তাই যেখানে—
ক) ট্রাস্ট বা কোম্পানি গঠন করা অতি সহজ।
খ) যেখানকার আইনে মালিক চিহ্নিত করা কঠিন।
গ) যেখানে কর্পোরেট ট্যাক্স শূন্য বা খুবই কম।
এগুলিকেই বলে 'ট্যাক্স হেভেন'। এর নির্দিষ্ট কোনো তালিকা নেই। তবে ব্রিটিশ ওভারসিজ টেরিটরি যেমন- ক্যেমন আইল্যান্ড, ব্রিটিশ ভার্জিনিয়া আইল্যান্ড এবং সুইজারল্যান্ড বা সিঙ্গাপুর।
কোম্পানিগুলি শেল বা খোলস। অর্থাৎ নাম কা ওয়াস্তে। আসলে তার কোনো অফিস বা স্টাফ থাকে না। অফিস এড্রেস আর পেইড কোম্পানি ডিরেক্টর প্রভাইড করে Specialist Farm। এই ফার্ম সব কিছু করে দেয়। যার কোম্পানি তাকে YOU KNOW WHO হিসেবে চিহ্নিত করে। অর্থাৎ তার পরিচিতি কঠোরভাবে গোপন রাখার ব্যবস্থা থাকে।
৬।।প্যান্ডোরা পেপারস কেলেঙ্কারি (২০২১) প্রকাশ্যে আসার আগে গত কয়েক বছরে পর পর আর্থসামাজিক সম্পদকে ব্যক্তি-ধন রূপে চুরি করে কোথায় কীভাবে গচ্ছিত করা হচ্ছে তার উদঘাটন বিভিন্ন সময় হয়েছে। যেমন-

### ক) FinCEN Files ( Sept, 2020)

এই উদঘাটন মেজর বৈশ্বিক ব্যাঙ্কগুলি বে-আইনি অর্থ লেনদেন (মানি লন্ডারিং) নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছে সেই তথ্য জনসমক্ষ্যে নিয়ে আসে। US Treasury দপ্তরের Financial Crimes Enforcement Agency সূত্রে এই তথ্য ফাঁস হয়।

### খ) Paradise Papers Leak 2017

এক্ষেত্রে Offshore শেল কোম্পানির মাধ্যমে ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে কীভাবে কালো টাকা গোপন করা হচ্ছে তার হদিস দিয়েছে ২০১৭ সালে।
এই কাজে BBC, The Guardian এবং পরবর্তীতে ICIJ ভূমিকা নেয়।

### গ) Panama Papers 2016

রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ, আইসল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী, ভারতের অনেক প্রভাবশালী যেমন অমিতাভ বচ্চন এর নাম সামনে আসে। নওয়াজ শরীফ ক্ষমতা হারান।
জন ডো নামক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি এইসব তথ্য সামনে আনে।

### ঘ) Swiss Leaks 2015

সুইজারল্যান্ড এর জায়ান্ট বেসরকারী ব্যাঙ্ক HSBS কীভাবে আর্মস ডিলার, ডিকটেটর, ব্লাড ডায়মন্ড ডিলার ও আন্তর্জাতিক অপরাধীদের অর্থ গোপনে সহায়তা করে প্রচুর প্রফিট করেছে সেই হিসেব সামনে আনে INTERNATIONAL CONSORTIUM OF INVESTIGATIVE JOURNALISTS।

### ঙ) Luxembourg Leaks 2014

বহুজাতিক কোম্পানি কীভাবে ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে ব্যবসা করে সেই দিকটি উদঘাটিত হয়। এবং

### চ) The Offshore Leaks 2012-13

এখানেও আন্তর্জাতিক ট্যাক্স ফাঁকির বিষয়টি সামনে আসে।
৭।। পানামা পেপারস কেলেঙ্কারি (২০১৬) সামনে আসার পর শত শত শেল কোম্পানি Mossack Fonseca Law Farm এর সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে দেয়। এটি এই ধরনের কাজের খুব বড় ফার্ম ।
অচিরেই অন্য কেউ তার স্থান দখল করে। নতুন কোনো নিরাপদ ট্যাক্স হেভেনে আবারো নতুন কোম্পানি!
এভাবেই চলতে থাকে ডাকাতবৃত্তি!
এই ডাকাতরা দিনের আলোতে ডাকাতি করে। সারা পৃথিবীতে এরা অত্যন্ত মান্য গণ্য নীতিবান ইত্যাদি বলে পরিচিত! কিন্তু আসলে ডাকাত!
রবিন হুডকে এই ডাকাতরাই 'ডাকাত' আখ্যা দিয়েছিল। বিশ্ববাসী তাঁর নাম আজও শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারণ করে! আর এই সমস্ত ডাকাতরা তাঁর নাম শুনলে আতঙ্কে কেঁপে ওঠে। কেন?
কারণ অপরিমেয় আর্থসামাজিক সম্পদের কুক্ষি করে গোটা আর্থসমাজকেই এরা ছিবড়ে করে দেয়। এরাই রক্ষ, এরাই দানব, এরাই বুর্জোয়া, এরাই কোরায়েশ, এরাই কৌরব! এদের এই ডাকাতির কারণেই আর্থসমাজে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, যৌনবৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদির সংক্রমণ ঘটে গোটা আর্থসমাজটাই নরক (নরের অক অর্থাৎ আগুন) হয়ে যায়।
এই নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে এদের ডাকাতির অর্থ আর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দাপট দুইকেই রবিনহুড চেতনা ভেঙে দেয়।
সেই চেতনা অর্জনের সাধনা না করলে কাল পানামা আজ প্যান্ডোরা করতে ডাকাতদের কোনোই দ্বিধা থাকবে না। ভদ্রবেশী এই ডাকাতদের ডাকাতি রুখতে রবিনহুড চেতনা অর্থাৎ রাজনৈতিক চেতনা অর্জনের বিকল্প নেই।
সেই চেতনা রাজনৈতিকভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকার করার আগে পর্যন্ত ডাকাতদের ডাকাতি চলতে থাকে!

# বিশ্ব 'উপজাতি' দিবস এর ফ্যালাসি!

গতকাল (৯ই আগস্ট,২০২১) ফ্রি-বিনোদন ঢাক-ঢোল -ধামসা-মাদলের তালে আদিবাসী নৃত্য সহযোগে উদযাপিত হল 'বিশ্ব আদিবাদী দিবস'। রক্ষের কোন কোন সংবাদ সংস্থা খবরটি কী শিরোনামে করল একটু দেখে নেয়া যাকঃ-

১। জি-নিউজ: World Tribal Day ২। এবিপি নিউজ: World Tribal Day ৩। হিন্দুস্থান টাইমস: World Tribal Day ৪। টাইমস অব ইন্ডিয়া: World Tribal Day ৫। আউটলুক ইন্ডিয়া: World Tribal Day ৬। রিপাবলিক ভারত: World Tribal Day ৭। দ্য ওয়্যার: World Tribal Day ৮। ডেকান ক্রনিকল: World Tribal Day ৯। টেলিগ্রাফ: World Tribal Day ১০। এনডিটিভি: World Tribal Day ১১। ফার্স্ট পোস্ট: World Tribal Day সহ বাকি প্রধান সংবাদ সংস্থা উক্ত টাইটেলে খবরটি করেছে।

ব্যতিক্রম: ১। ফ্রি প্রেস জার্নাল : International Day of World Indigenous People ২। নিউজ১৮: International Day of World Indigenous People ৩। দ্য হিন্দু: আদিবাসী ডে।

## জাতি, প্রজাতি ও উপজাতি

আভিধানিক অর্থে ইনডিজিনাস হল আদিম নিবাসী বা আদি নিবাসী যা 'আদিবাসী' বলে বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত। সমস্যা তাহলে কোথায়? এত গৌরচন্দ্রিকার কী হল? এত কাগজ-টিভির উল্লেখই বা কেন? কারণ আছে বন্ধু, তিষ্ঠ ক্ষণকাল!

গতকাল ছিল রক্ষকথিত 'বিশ্ব আদিবাসী দিবস'। এই দিনটি দয়া করে সে তাগো নামে ডেডিকেট করিয়াছে। আহা কী তাহার বদান্যতা! তাগোদের এই নাম কে দিল? কীভাবে? হ্যাঁ এইটাই প্রশ্ন। এই প্রশ্নবাচক অনুভূতির জবাবটি পাঠকের হৃদ-মস্তিষ্ক সমীপে হাজির করা যাক!

## অস্তিত্ব' এর তত্ত্ব সংকেত

মহাস্রষ্টার সৃষ্টির প্রতিজাত মানুষ। অর্থাৎ মানুষ জাতি। সেই প্রসঙ্গে উপজাত মানুষ বাদে সমস্ত প্রাণি ও উদ্ভিদ প্রাকৃতিকভাবে জীব-পদার্থিক। তার কোনো চেতনা নেই। তা প্রজাতি। মানুষ চেতনা সম্পন্ন। তাই বনচারী সেই মানুষকে রক্ষণকামিতার প্রজাতি বলার সাহস হয়নি। সে তাকে উপজাতি নাম দিল। তাকে কি সে চেতনা-রহিত মনে করে? করে না। তাহলে কোন নির্লজ্জতায় সে উপজাতি নাম দেয়। মানে তাকে সে মানব জাতির অংশই মনে করেনা! অথচ আবার সংরক্ষণী উদারতায় তারই কল্যাণ করার ছল করে! একটু ব্যাখ্যা করা যাক।

হাভাতে বানিয়া ঔপনিবেশিকতা ভাতের খোঁজে ছুটল দিক বিদিকে...দেশ দখল...জল-জমি-জঙ্গল দখল শুরু করল... বানিয়ার শোষণী হাত প্রকৃতি-নির্ভর এই মানুষদের ছিবড়ে করতে থাকল... বনবাসী এই মানুষ আরো গহীন গভীর বনে জঙ্গলে সরে যেতে থাকল... টিক টিক...টিক টিক...টিক টিক... মানব জাতির বিকাশের মেইন ট্র্যাক থেকে এভাবেই তাদেরকে পিছিয়ে দিল... এ বড় ভয়ানক ব্যাথাতুর ও বোবা কান্নার কাহিনি.... এভাবে এদের পশ্চাদপদ বানিয়ে দেওয়া মাথা নিজ পাপ গোপন করতে তাদের নামকরণ করে দিল 'উপজাতি' বলে। যা তার ভাষায় Tribe। 'জাতি' নয় 'উপজাতি'। কিন্তু মানুষ কি উপ-মানুষ হয়? হয় না। অতঃপর মানব জাতি। সে উপজাতি নয়। কিন্তু পাপ-চোখের লোভ তাকে উপজাতি বানিয়েছে। আবার সেই পাপ গোপন করতে সে-ই 'আদিবাসী উন্নয়নে'র হোতা সেজে বসেছে! আর তাতেই রক্ষের সংবাদ মাধ্যমের ট্রাইবাল শব্দের এত ফুলঝুরি বিজ্ঞাপন!

## শোষণ

সাঁওতাল, মুন্ডা প্রভৃতি বিদ্রোহগুলি কার বিরুদ্ধে ঘটেছিল? এই বানিয়া আর তাদের দেশীয় দোসরদের বিরুদ্ধে। যাদেরকে তারা 'দিকু' বলত। আন্দামানের 'জারোয়া'। এরকম কত না নানান নামে তাদের পরিচিতি। কত বিচিত্র অত্যাচারের বিচিত্র কত আখ্যান! শুনতে চাইলেই সহমর্মী মন শুনতে পায়। ইতিহাসের রেকর্ড থেকেই পায়।

রেড ইন্ডিয়ান! আমেরিকান নিগ্রো! আফ্রিকান নিগ্রো! কোথা থেকে এল? সবই ঔপনিবেশিক বানিয়ার শোষণ পাপের খোয়াড় থেকেই বেরনো।

## গোষ্ঠীগত আত্মকণ্ডুয়ন

শোষণী যাঁতাকল পিষ্ঠ এই মানুষ অভিমানী বনচারী-বনবাসী। আত্মকেন্দ্রিকতায় আত্মধ্বংসী। নিকট যৌনতায় কোষগত জেনেটিক এরোসন। সেখান থেকেই মেধালীনতা। আর তাতে কত এরকম গোষ্ঠী ধ্বংস হয়ে গেছে! এই মেধালীন অতি সরল মানুষকে দিয়ে তাদেরই বেগার শ্রমে কত মূল্যই বানিয়া রাক্ষস

চুরি করেছে, তার কি কোনো হিসেব আছে? সেই হিসেব কষতে না দিতে, সেই হিসেবের হদিশ না দিতেই সে তাদের উন্নয়নের ঠিকাদার সাজে। 'আদিবাসী কল্যাণ', 'বিশ্ব আদিবাসী ডে' ইত্যাদি বানাতে হয়।

## আজকের চিত্র

সভ্যতারূপী শোষণ-নগ্নতার আক্রমণে বনবাসী সেই মানুষ সভ্যতা থেকে দূরে বনের প্রাকৃতিকতায় জীবন খুঁজে নিতে চেয়েছে। আজ কর্পোরেট ট্রান্সফর্মড সেই রাক্ষস দেশে দেশে দিকে দিকে তাকে জল-জমি-জঙ্গলের থেকে উচ্ছেদের জন্য কতই না নতুন ফন্দি এঁটে চলেছে। ছত্রিশগড় থেকে আমাজন চিত্র তো একই!

অধিকারের প্রশ্নে সরব হলে নেমে আসে রাষ্ট্রীয় অনাচার। বিনাবিচার আটক। তাদের পক্ষে খাড়া হলে দেশবিরোধিতার তকমা! এই তো কদিন আগেই জেলের কুঠুরিতে তিলে তিলে শেষ করে দেওয়া হল স্টান স্বামীকে! এখনও কতজন জেল বন্দি!

## অথচ সংরক্ষণ

শোষণী যাঁতাকল অক্ষুণ্ন রেখে সে পার্লামেন্টি সংরক্ষণ এক্সটেন্ড করতে থাকে। অথচ বন আইন রূপায়ণ করে না। নির্বিচার বনধ্বংস বন্ধ করে না। কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, দামি ধাতু ইত্যাদির জন্য লকলকে লোলজিভ কর্পোরেট বন দখল করে! বনবাসী কোথা যায়? তার সংরক্ষণ লুট করে ভদ্র লুঠেরা!

## প্রতিবাদ

যে যে ফর্মে প্রতিবাদ হচ্ছে হোক। তার সাথে যুক্ত হোক " 'উপজাতি' 'ট্রাইবাল' কলঙ্ক দূর হঠাও" স্লোগান। উপজাতি নয়, নয় ট্রাইবাল, আদিবাসীও নয়। বনবাসী। মানব জাতিরই অংশ! তাদের মানব অধিকার এর জন্য লড়াই। খাবার-পোশাক-আবাস- একাডেমিক শিক্ষা-চিকিৎসা-যোগাযোগ নিশ্চিত কর।

শ্রমমূল্যের হিসেব কষতে কষতে একদিন নিকট যৌনতার সামাজিক প্রথা পরিত্যাজ্য হবে নিশ্চয়! মস্তিষ্ক আর কলা কোশ ফিরে পাবে তার মেধাগত সক্রিয়তা। তার সুযোগ চায়! কে দেবে? রক্ষণকামিতা? ব্রাহ্মণ্য বর্ণবাদ? নৈব নৈব চ! তাহলে?

## প্রতিকার

মুক্তবাজারি অর্থনীতির ঘুঁটি যে আঁতুড় ঘর থেকে সাজানো হয়, সেই ঘরই তো আলোচ্য পাপ সহ আরো নানান পাপের জঘণ্য জন্মদাতা। তাকে পরাজিত করে পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রণয়নেই অধিকার বাচক আর্থসমাজের পুনর্গঠন। তাতেই সামিল হোক সব্বাই! সেই লক্ষ্যে জ্ঞান-বিশ্বাস-সংগ্রামের ত্রিশূল অর্জনের সাধনা রূপ সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞ এখনকার কাজ।
যার প্রথম ধাপ হল ধারণা নিশ্চিহ্ন করে বিশ্বাস অর্থাৎ শক্তি সঞ্চারণ!

---


ভয়েস মার্ক
পড়ুন পড়ান
গ্রাহক হোন

# পেট্রোল ও ডিজেলের দাম কীভাবে নির্ধারিত হচ্ছে?

কিছুদিন আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় পেট্রোল ও ডিজেলের ট্যাক্স রাজ্য সরকার কত বেশি নিচ্ছে আর কেন্দ্র কত কম নিচ্ছে রীতিমতো ব্রেক-আপ কষে তার মিথ্যে হিসেব ছড়ানো হয়েছিল। নিশ্চয় তা বৃহৎ সেলের তরফেই করা হয়েছিল। সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ ভালো সংখ্যক পরিচিত লোককে দেখলাম সেই 'ফেক' ডাটা সাড়ম্বরে শেয়ার করছেন। আমার কিছু অতি পরিচিত কিন্তু এখানের শাসক দল বিরোধী ছেলে -মেয়েকেও দেখলাম একই কাণ্ড করতে। অথচ এরা জানেই না, যে পেট্রোপণ্যের দাম কীভাবে নির্ধারিত হয়। আজ অব্দি দাম বেড়েই চলেছে। বিভ্রান্তিও বাড়ানো হচ্ছে। একটু কমানো যাক বিভ্রান্তি।

১।। ২০১০ সাল পর্যন্ত এই দুটি দামই সরকার নির্ধারণ করত। মনমোহন সিংহ ঐ বছরই পেট্রোলের দাম ডিরেগুলেট (বাজারের উপর ছেড়ে দেওয়া) করে দেন। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি ডিজেলের দাম ডিরেগুলেট করে দেন। ২০১০ পর্যন্ত সরকার প্রতি পক্ষে দাম রিভাইজ করত, আন্তর্জাতিক বাজারের দামের ওঠা-নামার হিসেবের ভিত্তিতে। বিজেপি সরকার ২০১৭ সাল থেকে গ্লোবাল প্রাইসিং সিস্টেম অ্যাডপ্ট করে যাতে পেট্রোল-ডিজেলের দাম প্রতিদিন রিভাইজ হতে পারে। এই সময় থেকে বাজারের খরচের হিসেবের ভিত্তিতে কয়েকটি পিএসইউ অর্থাৎ সরকারি কোম্পানি—

1. Indian Oil Corporation Ltd- IOCL

2. Bharat Petrolium Corporation Ltd-BPCL

3. Hindustan Petrolium Corporation Ltd-HPCL

এরা পেট্রোল ডিজেলের দামের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়। কীসের ভিত্তিতে নেয়? আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রুড ওয়েলের (অপরিশোধিত তেল) দাম, বিনিময় হার, আন্তর্দেশীয় ফ্রেইট (পরিবহন), ট্যাক্স ও অন্যান্য খরচের ভিত্তিতে। ৮ই মার্চ ২০২১ লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে এই তথ্য জানা গেছে।

২।। পেট্রোলিয়াম পণ্যের দাম বৃদ্ধি চারটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

ক) বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দাম, পরিবহন খরচ, ডিলারের প্রসেসিং চার্জ।

খ) কেন্দ্রীয় এক্সাইজ ডিউটি (কেন্দ্রীয় ট্যাক্স)

গ) ডিলার কমিশন

ঘ) রাজ্যের ভ্যাট ( ভ্যালু এডেড ট্যাক্স)।

৩।। আমাদের দেশের মোট চাহিদার ৮২%-৮৫% পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি করতে হয়।

৪।। ১৬ জুন ২০২১ এ দিল্লিতে দামের হিসেব

### পেট্রোল

প্রাইস এলিমেন্ট

বেস প্রাইস ৩৭.২৯ টাকা

পরিবহন চার্জ ০.৩৬ টাকা

ভ্যাট ও এক্সাইজ বাদে ডিলারের মূল্য ৩৭.৬৫ টাকা

এক্সাইজ ডিউটি ৩২.৯০ টাকা

ভ্যাট ২২.৩১ টাকা

মোট ৯৬.৬৬ টাকা।

### ডিজেল

প্রাইস এলিমেন্ট

বেস প্রাইস ৩৯.৯০টাকা

ফ্রেইট চার্জ ০.৩৩ টাকা

ডিলার যা চার্জ করে

ভ্যাট ও এক্সাইজ বাদে ৪০.২৩ টাকা

এক্সাইজ ৩১.৮০ টাকা

ভ্যাট ১২.৭৯ টাকা

ডিলার কমিশন ২.৫৯ টাকা

মোট ৮৭.৪১ টাকা।।

৫।। তাহলে দেখা যাচ্ছে মোট দামের ৬০% ও ৫৬% ট্যাক্সে যাচ্ছে যথাক্রমে পেট্রোল ও ডিজেলের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ ক্রুড ওয়েলের দাম স্থিতিশীল থাকলেও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ট্যাক্সের জন্য পেট্রোলিয়াম পণ্য এত মহার্ঘ্য।

৬।। আন্তর্জাতিক বাজারের হিসেবে মে, ২০১৪ বেস মূল্য ৪৭ টাকা থেকে জুন ২০২১ এ কমে হয়েছে ৩৭.২৯ টাকা। কেন্দ্রীয় ট্যাক্স মে ২০১৪ ১০.৩৯ টাকা থেকে জুন ২০২১ এ বেড়ে হয়েছে ৩২.৯০ টাকা। অর্থাৎ ক্রুড ওয়েল এর দাম কমলেও ডিজেল-পেট্রোলের দাম প্রচুর বেড়েছে কারণ ট্যাক্স প্রচুর

বেড়েছে। দেখা যাচ্ছে পেট্রোল ও ডিজেলের দামের দুই তৃতীয়াংশ ট্যাক্সের কারণে।

৭।। প্রতিবেশী দেশের সাথে তুলনামূলক দাম

| দেশ | পেট্রোল | ডিজেল |
|---|---|---|
| ভারত | ৯৯.৩১ টাকা | ৯১.৮৯ টাকা |
| বাংলাদেশ | ৭৭.৭৮ টাকা | ৫৭.০৪ টাকা |
| পাকিস্তান | ৫১.৮৭ টাকা | ৫২.৬৭ টাকা |
| শ্রীলঙ্কা | ৬৮.১৮ টাকা | ৪১.৪৯ টাকা |
| ভুটান | ৬৯.৬৯ টাকা | ৬৭.৪৮ টাকা |
| আফগানিস্তান | ৪৬.২৮ টাকা | ৪৮.১৯ টাকা |

সূত্র: Global Petrol Price as on 14th June, 2021

বেশি দামও রয়েছে। যেমন জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি ও হংকং-এ ভারতের থেকে অনেক বেশি দামে পেট্রোপণ্য বিক্রি হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে তাদের পার ক্যাপিটা ইনকাম অর্থাৎ মাথা পিছু আয় ভারতের তুলনায় অনেক অনেক গুণ বেশি। যেমন ভারতে জনতার এভারেজ মাসিক আয় ২৫-৩০ হাজার। জার্মানির নাগরিকের এভারেজ মাসিক আয় ১.৫-২ লক্ষ টাকা।

৮।। বিভিন্ন রাজ্যে ডিজেল-পেট্রোলের বিভিন্ন দাম কেন? কারণ বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন VAT অর্থাৎ ভ্যালু এডেড ট্যাক্স বা সেলস ট্যাক্স রাজ্যগুলি নির্ধারণ করে। শুধু VAT নয় অতিরিক্ত কিছু মাশুলও নির্ধারণ করতে পারে।

উদাহরণ:

(১) মধ্য প্রদেশ: 33% vat+Rs 4.5/ltr addl vat+ 1% cess-পেট্রোল। 23% vat+ Rs 3/lit addl vat+ 1%cess-ডিজেল।

(২) রাজস্থান: 36% vat+ Rs1500/KL Road Development cess- পেট্রোল।

26%vat+Rs1750 /KL R D Cess-ডিজেল।

(৩) উত্তর প্রদেশ: 26.80% vat or Rs 18.74/ltr যেটি বেশি - পেট্রোল। 17.48% or Rs 10.41/litr যেটি বেশি -ডিজেল।

(৪) মহারাষ্ট্র: 26% vat+ Rs 10.12/litr additional tax-পেট্রোল। 24% vat+Rs3/lit addl tax - ডিজেল।

(৫) তামিলনাড়ু 15% vat+ Rs 13.02/lit addl vat - পেট্রোল। 11% vat+9.62/litr addl vat-ডিজেল।

(৬) ওড়িশা: 32% vat- পেট্রোল এবং 18% vat-ডিজেলের জন্য।

(৭) কেরালা: 30.08% vat+ Rs 1/ addl tax+1% cess-- পেট্রোল

22.76% vat+Rs 1/lit addl tax+1% cess--ডিজেল।

(৮) পশ্চিমবঙ্গ: 25% or Rs 13.12/lit vat যেটি বেশি +Rs 1000/KL cess-Rs 1000/KL sales tax rebate-- পেট্রোল।

17% vat or Rs 7.70/lit যেটি বেশি + Rs 1000/ KL cess- Rs 1000/KL sales tax rebate-ডিজেল।

সূত্র: Petroleum Planning and Analysis Cell, 1st June, 2021 (পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালার হিসেবটি ০১/০৯/২০২১ এর হিসেব)

৯।। জানা যাচ্ছে বর্তমানে পেট্রোল ও ডিজেলের মোট দামের যথাক্রমে ৬০% ও ৫৬% ট্যাক্সের খাতে যাচ্ছে। হিন্দুস্তান টাইমস ২২শে মার্চ ২০২১ থেকে জানা যাচ্ছে গত ৬ বছরে কেন্দ্রীয় ট্যাক্স বেড়েছে ৬০০%। ২০১৪ সালে পেট্রোলের লিটার প্রতি এই ট্যাক্স ছিল ৯.৪৮ টাকা। ২০২১ এ তা ৩২.৯০ টাকা। যার নাম Excise Duty। ডিজেলের ক্ষেত্রে লিটার প্রতি যথাক্রমে ৩.৫৬ টাকা থেকে বেড়ে এই সময় কালে হয়েছে ৩১.৮০ টাকা।

১০।। বিনিয়ন্ত্রণ এর প্রশ্নে কংগ্রেস ও বিজেপি উভয়েই দায়ী। কিন্তু যা দেখছি তাতে বিনিয়ন্ত্রণের কারণে এই অস্বাভাবিক দাম নয়। তার কারণ মাত্রাতিরিক্তভাবে কর আদায়।

পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান সহ বর্তমান শাসক দলের লোকজন এত দাম বৃদ্ধি ও দাম নিয়ন্ত্রণ না করার কারণ হিসেবে যা বলছেন-

১। কোভিড ভ্যাক্সিন খাতে বছরে ৩৫০০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

২। জনকল্যাণ মূলক অন্যান্য প্রকল্প চালাতে

পেট্রোলিয়ামের এই ট্যাক্স সরকার কাজে লাগাচ্ছে।

৩। গরীবদের অসুবিধা হচ্ছে না। কারণ তাদের এই পণ্য লাগে না।

উল্লিখিত কথাগুলি যে গণতন্ত্রের পরিসরে একটি রাজনৈতিক দলের কথা হতে পারেনা, মানে এই কথাগুলি চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ। পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি মানে তার প্রভাব প্রতিটি খাতে পড়তে বাধ্য এই কথাটি পর্যন্ত এরা মনে রাখে না। কেন, জনতাকে এদের ভয় নেই? না। কারণ জনতার নাগরিক চরিত্র, রাজনৈতিক চরিত্র আর সামাজিক চরিত্র গড়ে উঠতেই দেওয়া হয় নি। উক্ত চরিত্র গড়ে না তুললে ক্ষমতাকে প্রশ্ন করা যায় না। ফলে শুধু পেট্রোল কেন যেকোনো বিষয়েই মগজ ধোলাই হবার জন্য আমরা অর্থাৎ জনতা মুখিয়ে থাকি!

তাই রাজনৈতিক চেতনার যেটুকু সামান্য স্ফুলিঙ্গ এখানে ওখানে রয়েছে তাদের ভূমিকা অন্ধকারে আলোর রেখাগুলি বিস্তারিত করে তোলা! নয় কি??

তথ্যসূত্র:

১। *Scroll. in* 20.06.2021

২। Hindustan Times 22th March, 2021

৩। The Hindu

৪। Petrolium Planning and Analysis Cell Website

# পেগাসাস কেলেঙ্কারি

তুরস্কে নিহত সৌদি সাংবাদিক জামাল খাসোগির মোবাইল ফোনে পেগাসাস সফটওয়্যারটি পাওয়া গিয়েছিল। সংবাদ মাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে। ওয়াশিংটন পোস্টের ওই সাংবাদিক নিহত হওয়ার ঘটনা ও তার সাথে সৌদি সরকারের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি যুবরাজ সলমানের নাম জড়িয়ে যাওয়া। পরবর্তীতে তদন্তের নামে কার্যত সাক্ষ্য প্রমাণ লোপাটের ব্যবস্থা করা একটি বিষয় পরিষ্কার করে দেয়। রাষ্ট্র তার নাগরিকের উপর নজরদারি চালালে তা কী ভয়ানক রূপ নিতে পারে। খাসোগির দেহকে কেটে খণ্ড খণ্ড করা হয়েছিল।

অতীত থেকে অদ্যাবধি রাষ্ট্র তার নাগরিকদের গুপ্ত-নজরদারির আওতায় রেখেছে বিভিন্ন সময়। কখনও কখনও স্তরে স্তরে বিন্যস্ত ছিল এই চরবৃত্তি ব্যবস্থাপনা। রাজতন্ত্র-থেকে গণতন্ত্রের প্রথম যুগ সবটাতেই এই নজরদার চোখ তাড়া করে ফিরেছে। নাগরিক বা প্রজা এই চরবৃত্তি সারটেন লেভেল পর্যন্ত মেনেও নিয়েছিল। তা ছিল ক্যু বা অভ্যুত্থান প্রতিরোধ অথবা প্রাসাদ ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ ইত্যাদি। সেখানে রাষ্ট্র বা তার শাসক সরাসরি নাগরিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি।

আধুনিক কালে এসে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব তার ক্ষমতা যতটা না ষড়যন্ত্র প্রতিরোধে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হল তার চেয়ে বেশি তার বিরুদ্ধে ওঠা প্রতিবাদী কণ্ঠকে ধ্বস্ত করার কাজেই বেশি বেশি লাগাতে শুরু করল। এবং সেটি তখন সে স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার আধিপত্যেও করছে না। রীতিমত নির্বাচনী গণতন্ত্রকে ব্যবহার করে অর্থাৎ তার আইনগত পরিকাঠামোকে ব্যবহার করেই এই কাণ্ড সে করতে শুরু করল। তার ক্ষমতার জন্য হুমকি বলে যাকেই সে মনে করল তার উপরই সে গুপ্তচর বৃত্তি গোপন খুন ইত্যাদি কাণ্ড চাপিয়ে দিতে লাগল।

কিছু উদাহরণ: সক্রেটিসের হত্যাকাণ্ড ( 470-399 BC)। মনসুর আল হাল্লাজের হত্যাকাণ্ড ( 858-922 CE)। ইমাম আল গাজ্জালির (1058-1111 CE) উপর নজরদারি। গোটা মধ্যযুগের ইউরোপের কথা না হয় ছেড়ে দেওয়া গেল। ঔপনিবেশিক সময় কালে এই নজরদারি বা গ্রেফতার ছিল জলভাতের মত। আমাদের দেশে যার সবচেয়ে বড় উদাহরণ সুভাষ চন্দ্র বসু (1897-1945 (?)। যাকে ব্রিটিশ সরকার তার গোপণ ডায়েরিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যক্তি বলে মার্ক করে রেখেছিল। তাঁর জীবনের সক্রিয় রাজনীতি পর্বে ভারতে থাকাকালীন বেশির ভাগ সময়টায় ছিল হয় জেলের মধ্যে অথবা গৃহবন্দি হিসেবে। আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন ও স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনার এক পর্যায়ে তিনি যে গুম-খুন হননি তা ঐতিহাসিকরা হলফ করে বলতে পারেন না।

## প্রযুক্তি ও নজরদারি

জেমস বন্ড সিরিজের মুভিগুলি অবজার্ভ করলেই বিগ ব্রাদার কোথায় বসে কাকে দিয়ে কীভাবে কখন কার উপর নজরদারি চালায় তা মালুম পাওয়া যায়। শুধু নজরদারি নয়, প্রয়োজনে কাউকে সরিয়ে দেওয়া, নাশকতা ঘটানো অতি সহজ ব্যাপার। সেটি তো আন্তর্জাতিক ক্ষমতা প্রভুত্ব রক্ষার প্রশ্ন। এখন যে রাষ্ট্রগুলি নিজ নাগরিকদের উপর নজরদারি চালাচ্ছে!

এডোয়ার্ড স্নোডেন যা কয়েক বছর আগে ফাঁস করেছিলেন।

এই প্রেক্ষাপটে পেগাসাস সফটওয়্যার কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে এল। ইজরায়েলি স্পাই সফটওয়্যার। কোনো ব্যক্তির ফোনে তার অজান্তে ইন্সটল করে দিয়ে তার জীবনের প্রতিটি ঘটনা ডিজিট্যালি ইম্প্রিন্ট করে নেওয়া। যখন খুশি তা তার বিরুদ্ধে কাজে লাগানো।

## পেগাসাস: বিশিষ্টতা

১. এটি কেবল আঁড়ি পাতার ঘটনা নয়। এটি একজনের জীবনের সামগ্রিক খুঁটিনাটি গোপনে কপি করে নেওয়া।

২. তাতে সেই ব্যক্তিই কেবল সমস্যায় পড়ল না, যারা তার সাথে কোনো না কোনো ভাবে যুক্ত তারাও অসহায় অবস্থায় পড়ে গেল।

৩. স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের উপর সার্ভেল্যান্স আক্রমণ।

প্রথমত, কোর্টের কার্যাবলী এই ছায়া সার্ভেল্যান্সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জাজরাও যেহেতু এর আওতা থেকে পার পাবে না।

দ্বিতীয়ত, অন্যান্য গণতান্ত্রিক ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক নৈর্ব্যক্তিকতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেমন, বিরোধী দল, নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক সতীর্থদের এর বলি হতে হবে। পরিণামে পরবর্তী নির্বাচন সহ ক্ষমতা কজার মেশিনারি হিসেবে এই সার্ভেল্যান্স কাজ করতে থাকবে।

৪. দেশের নিরাপত্তার উপর প্রভাব পড়বে। ভালো রকম। কারণ ইজরায়েলের এই সফটওয়্যার প্রযুক্তির হ্যান্ডলিং ক্ষমতা ইজরায়েল সহ আন্তর্জাতিক বিগ ব্রাদারদের দ্বারা অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রিত। স্বীয় নাগরিক, বিরোধী দল ও প্রতিষ্ঠানের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতে গিয়ে হাঁড়ির হাল আন্তর্জাতিক হাটে উঠবে না তার কোনো গ্যারান্টি নেই।

তাই যদি কেউ বলেন, পেগাসাস কোনো সফটওয়্যার প্রযুক্তি নয় এটি হচ্ছে সেই সাইবার দানব যা ভারতীয়দের উপর নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাহলে কি খুব অত্যুক্তি হয়?

## তদন্ত দাবি ও সরকারের মনোভাব

বিরোধীরা তদন্তের দাবি করেছে। সরকার নীরব। দু-একটি রাজ্য হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতিদের দিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। শুরুটা করেছে পশ্চিমবঙ্গ। সুপ্রিম কোর্টে কেস হয়েছে। ক্ষমতা বলছে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত। কেন, কীভাবে ব্যাখ্যা দিচ্ছে না। সংসদে এনিয়ে হল্লা চলছে।

## সামাজিক নৈতিকতা ও নজরদার সফটওয়্যার

মার্কিন ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারি সামনে আসায় প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করেছিলেন। গত সরকারের আমলে টুজি, কয়লা ইত্যাদি কেলেঙ্কারির কথা উঠলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর পদত্যাগ এমন কি গ্রেফতারের ঘটনা পর্যন্ত ঘটেছে।

গত সাত বছরে একের পর এক অপরিণামদর্শী এবং জন-ভোগান্তির কাণ্ড কারখানার পরও কোনো ক্ষমা প্রার্থনা, কোনো তদন্ত, কোনো পদত্যাগ কোনো গ্রেফতার এর প্রশ্নই ওঠেনি। ক্ষমতার শীর্ষস্থানটি যখন মিথ্যার আইকনে পর্যবসিত হয় তখন বুঝি এমনই হয়! যেমন,

১. নোটবাতিল— কোনো ভুল স্বীকার নয়, ক্ষমা চাওয়া নয়। কোনো তদন্ত নয়। কয়েকশো লোক এমনি মরে গেল।

২. ট্যাক্স— অনিয়মের কোনো তদন্ত নয়।

৩. ইলেকটোর‍্যাল বন্ড— কোনো ব্যাপার না।

৪. বিতর্কিত গোষ্ঠীর সঙ্গে আর্থিক লেনদেন— কোনো ব্যাপার না।

৫. উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারের সন্ত্রাস-যোগ কোনো তদন্ত নয়। চুপি চুপি চাকরি থেকে অব্যাহতি দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলা।— কোনো ব্যাপার না।

৬. সিটিং জাজ এর রহস্য মৃত্যু— কোনো ব্যাপার না।

তাহলে সামাজিক নৈতিকতার ছিঁটেফোটা অবশিষ্ট আছে কি? নেই। এরই ধারাবাহিক দৃষ্টান্ত পেগাসাস কেলেঙ্কারি! এবং এত হল্লার পরও সরকারের অনড় অবস্থান!

এখন প্রশ্ন হল, সেই সামাজিক নৈতিকতার দোহাই দিয়ে কি এই অনৈতিক ক্ষমতাকে পরাজিত করা যাবে?

করা যাবে না। বরঞ্চ এথিক্স নির্ভর পলিটিক্সের জন্মোত্থান প্রয়োজন। যার এথিক্স-চর্চা সামাজিক নৈতিকতাকে নিশ্চয়ই সেই মান (Level) দেবে যা আখেরে রক্ষণকামী ক্ষমতার বর্বতাকে উপযুক্ত জবাব দিতে পারে। আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক সেই চর্চায় পাণ্ডব-কৌরব ঠিকই চিহ্নিত হয়।

কুরুক্ষেত্রের মাঠ তখন খুব দূরের ব্যাপার না!

বিষয়টি ভাবা কি খুব দুষ্কর? ভাবাটাই জরুরী। ভাবের পুরাণ না থাকলে বস্তুর বাস্তবায়নের প্রশ্ন ওঠেনা!

# তালিবান: রক্ষণকামের নৃশংস হাতিয়ার

মাত্র কিছুদিনের মধ্যে আমেরিকান সেনা প্রত্যাহার। তার কিছুদিনের মধ্যে বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে আবার উচ্চারিত তালিবানদের নাম। তারা আফগানিস্তান দখল করল বলা যায় বিনা রক্তপাতে। এনিয়ে পশ্চিম ও পূর্বের সংবাদ মাধ্যমগুলি পরস্পরবিরোধী খবর পরিবেশন করে চলেছে। একটি উল্লেখ্য বিষয়, আফগান সেনা কিন্তু তালিবানদের কোনো প্রতিরোধই করেনি। দুএকটি ছোটো খাটো অঞ্চল বাদে পুরো আফগানিস্তান এখন তাদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন।

১) পাকিস্তান ও চিন তাদের সরাসরিভাবে সাপোর্ট করছে। আমেরিকানরা সাপোর্ট করবে বলছে। ভারত কী বলবে বুঝতে পারছে না। কারণ ২০১৪ থেকে সে দুই রণাঙ্গনে খেলছে। বড় রণাঙ্গন হোমফ্রন্ট অর্থাৎ দেশের জনতা! তাদেরকে মোকাবিলা করা! যদি তাদের পরস্পর ঐক্য ঘটে যায়! যদি হিন্দু-মুসলমান বাইনারিতে জনতাকে বাঁটা না যায়! তাহলে তো বিপদ! পরে ক্ষমতায় আসব কী করে? তাই সাবধানে কথা বলতে হবে। যদি কয়েক লক্ষকোটি টাকা নষ্ট হয় হোক, কী আর করা যাবে? এভাবে আমেরিকার কথায় বিনিয়োগ করাটা যে ব্লান্ডার হয়েছে এখন মালুম হচ্ছে! তবু হোমফ্রন্টে হারা যাবে না! বেচারা বিদেশ মন্ত্রী! শিক্ষা-দীক্ষা হাতি-ঘোড়া নিয়ে কী হল ছাই!

২) যাক সে কথা। বরঞ্চ তালিবানের কথায় ফিরি। এরা কারা? কেন এত কথা এদের নিয়ে? এদের সাথে ইসলাম ও উগ্রপন্থার সম্পর্ক? এবার এরা একটু আলাদা কথা বলছে যে বড়? ভাল তালিবান, মন্দ তালিবান? বিশ্বব্যবস্থার মালিকগণ এদের নিয়ে কেন বহুধা-বিভক্ত?

৩) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর শীতল যুদ্ধের এক মোহরা এই তালিবান নামক উগ্র-বর্বর সন্ত্রাসী গোষ্ঠী। আফগানিস্তানের স্ট্র্যাটেজিক ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে সোভিয়েত সম্প্রসারণবাদীরা এই অঞ্চল দখল নেয়। পুতুল সরকার বসায়। ভারত-চিন-পাকিস্তান সবগুলোকেই এখান থেকে স্পষ্ট করে লক্ষ্য রাখা যায়। ব্রিটিশোত্তর নয়া বিশ্ব তাঁবেদার আমেরিকার এই ভূখণ্ড দরকার। কীভাবে দখল করা যায়? রপ্তানি করা কম্যুনিজম এর বিরুদ্ধে ধর্ম-সুড়সুড়ি ইন্ধন শুরু হল। বানানো হল মুজাহিদিন গোষ্ঠী। প্রশিক্ষণ-অস্ত্র-টাকা সবই দেওয়া হল। ক্রমেই একদিন নাজিবুল্লাকে ল্যামপোষ্টে ঝুলিয়ে সেই গোষ্ঠী ক্ষমতা দখল করল। ততদিনে তাদের নামকরণ হয় তালিবান। পাঁচটি বছরে আফগানিস্তানকে তারা বর্বর-স্যাভেজ যুগে নিয়ে গেল। বন্দুকের জোরে আক্ষরিক মোল্লাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করল। নারীকে ক্রীতদাসে পরিণত করল। আলকায়েদা নামক আর এক মৌলবাদী গ্রুপের সাথে যুক্ত হল তারা। বন্দুক ঘুরিয়ে ধরল এবার পৃষ্ঠপোষক-বাপ আমেরিকার বিরুদ্ধে।

ইতিমধ্যে বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে সন্ত্রাসী হানায় প্রায় চার হাজার লোক নিহত হল। আমেরিকা এই জন্য আলকায়েদা ও তার নেতা ওসামা বিন লাদেনকে দায়ী করল। মৌলবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার নামে আফগানিস্তান দখল করে নিল। দীর্ঘ লড়াইয়ে তালিবানরা দেশটির প্রত্যন্ত পাহাড়ি এলাকায় আশ্রয় নিল। পাকিস্তানের বিভিন্ন ঘাঁটিতে আশ্রয় পেল।

দেশটিতে পুতুল সরকার বানিয়ে দিল আমেরিকা। যার প্রধান হলেন আশরাফ ঘানি। ইতিমধ্যে সংঘর্ষ থেমে ছিল না। কফিন বন্দি আমেরিকান সেনার লাশের সংখ্যা দিনকে দিন বাড়ছিল। ওবামা-ট্রাম্প-বাইডেন দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষোভের মুখে পড়ছিলেন। বাইডেন সম্পূর্ণ সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিলেন। কয়েক দিনেই খেল খতম। পুতুল সরকার তাসের ঘরের মতই ভেঙে গেল। পুনরায় আফগানিস্তান দখল করল তালিবানরা।

৪) সোভিয়েতের বিরুদ্ধে এদের কীভাবে কাজে লাগিয়ে ছিল আমেরিকা? ওরা নাস্তিক। ওরা ধর্ম বিরোধী। ওরা ইসলাম বিরোধী। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে 'ইসলামিক ধর্ম-ধারণার' এই সেন্টিমেন্টাল ব্যবহার। 'খ্রিস্টান ধর্ম-ধারণা' বা 'ইহুদি ধর্ম-ধারণা'কে এভাবে ব্যবহার করা যায় না। এদিকে উপমহাদেশে হিন্দু 'ধর্ম-ধারণা'কে অপরাপর উক্ত ধর্ম-ধারণার মত ব্যবহার করা যায়নি কিন্তু ব্রিটিশের হিন্দু-মুসলিম বিষ বীজের পরিণাম আজও দেশবাসী ভোগ করছে।

শুধু তাই নয়। এই ধারণাটিকে উক্ত তিনটি ইব্রাহামিক ধর্ম-ধারণার মত ব্যবহার করার জন্য বহুবছর ধরে ফেটে মরে যাচ্ছিল যারা তারা আজ দেশের ক্ষমতায়! মানে আরএসএস-বিজেপি।

৫) ইসলাম নিয়ে কিছু ধারণা পরিষ্কার করা যাক। ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে মক্কাবিজয়ের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে অভূতপূর্ব এক আর্থসমাজ সাংস্কৃতিক জীবন ধারার

জন্ম হয়। একটি বিপ্লব সাধিত হয়। তার ইডিওলজিক্যাল ভিত্তি আলকোরানিক দর্শন। হজরত মুহাম্মদ(স:) এর দেহত্যাগ পরবর্তীতে এই বিপ্লবী জীবনচর্চার কালসীমা ৬৬১ খ্রিস্টাব্দ অব্দি। হজরত আলির ক্ষমতা-কাল পর্যন্ত।

৬) রাজনৈতিক প্রশাসনিক দিক নির্দেশনা সহ আর্থসামাজিক সাংস্কৃতিক গাইডলাইন। অতীত বিযুক্ত বর্তমান সমস্যা-সংকট সমাধান নির্ভর জীবন ব্যবস্থা! অস্তিত্ব ব্যাখ্যানে যা দেহপ্রবন্ধবিধেয় বিধান! এই জীবন দর্শনের বাস্তবায়ন প্রযুক্তি মধ্যপ্রাচ্যের আর্থসমাজে বহাল ছিল ২৯টি বছর। কিন্তু উপুর্যপরি ষড়যন্ত্রে একের পর এক হজরত উমর, হজরত উসমান ও হজরত আলি নিহত হন।

৭) হজরত আলি নিহত হলে খলিফা নির্বাচনের ব্যবস্থা রহিত হয়ে যায়। মোয়াবিয়া ক্ষমতা দখল করে। পৈতৃক ক্ষমতা-রীতি চালু করে। আলকোরানিক জ্ঞান-প্রজ্ঞার সমকালীন গবেষণা ভিত্তিক গাইডলাইনের বদলে সুন্নার নামে হাদিসি কাণ্ডকারখানার সূচনা এখন থেকেই! রাষ্ট্রীয় মদতে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কাহিনি বানানো হতে থাকে রাতারাতি। (Islamic Studies Vol-II; Ignaz Goldzihar)। একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানকে নিয়তিবাদে পর্যবসিত করা হয়। ধীরে ধীরে উমাইয়া শাসনের মধ্যগগন পর্যন্ত সময়েই ইসলামের আর্থসামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ভূমিকা শেষ করে তাকে একটি ধর্মে পরিণত করে ফেলা হয়! ইসলামের নামে নানান ফতোয়া, নারীদের বন্দি কর, নতুন গবেষণা ইত্যাদি বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখন থেকেই ইসলাম একটি তাকে তুলে রাখা ঐতিহ্য যার সাথে জীবন তার সমস্ত যোগ হারাতে থাকে। কতগুলি অনমনীয় অনুষ্ঠানের আবর্তনের নাম ইসলামে পর্যবসিত হতে থাকে।

৮) উমাইয়া ক্ষমতা পর্ব ( ৬৬১-৭৫০) শেষ হলে এসে যায় আব্বাসীয়রা। ইসলাম প্রথাপালনী ধর্মই থাকে। কেবল অনমনীয় অর্থডক্সি চেঞ্জ হয়। গবেষণা শিক্ষার বিস্তার হয়। যারই মুক্ত জানালায় ওই যুগটিতে আরবীয় দর্শন, বিজ্ঞান উৎকর্ষের পরিচয় দেয়। কিন্তু রাজনৈতিক জীবনে তার কোনোই প্রভাব আসেনা। তবু সেই পিরিয়ডে শিক্ষা-সংস্কৃতি দর্শনের কিছু কাজ হয়েছিল। যেমন গ্রীক দার্শনিক সূত্রগুলি বিশেষ করে প্লেটো আরবীতে অনূদিত হয়। শুধু তাই নয় আরবীয় পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ও দর্শনের চর্চা এই যুগটিকে স্বাতন্ত্র্য দেয়।

৯) উমাইয়া পরবর্তী শাসন আমলগুলি আব্বাসীয়, ফতিমিদ ইত্যাদি ৭৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে ইসলামকে প্রথাপালনী ধর্ম হিসেবেই রেখে দিয়ে আর্থসামাজিক রাজনৈতিক ইত্যাদি ইশ্যুতে খমতা-স্বরূপ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিত। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের কাজ রাজনীতিতে প্রভাবী ভূমিকায় আসতে দেওয়া হত না। উদাহরণ, ইমাম আল গাজ্জালি! মনসুর আল হাল্লাজ। দ্বাদশ পরবর্তী সময় কালে একাডেমিক এই জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চারও ছিটেফোঁটাও আর অবশিষ্ট রইলো না। থিয়োলজি চর্চার নামে অর্থডক্সি দার্শনিক চিন্তাভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল। নিয়তিবাদ গেড়ে বসল। সেখান থেকেই আজকের জড়ভোগী মধ্যপ্রাচ্য!

১০) খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসন আমল (৬৩২-৬৬১) শেষ হবার পর থেকেই অর্থডক্সি তার থাবা বিস্তার করতে শুরু করে। বিকাশ রুদ্ধতায় অনুষ্ঠান বেড়ে যেতে থাকে। তার জৌলুস ক্রমশ বর্ধমান! নারী বন্দি হতে থাকে। ইসলামের সোসিও-কালচারাল পলিটিক্স শেষ করে দেওয়া হল। জাকাত প্রযুক্তিকে অকেজো করে দেওয়া হল। ইসলাম ধর্ম তকমায় বন্দি! এইটি নানান দেশ পরিক্রমা করতে থাকলো। ইসলামি ট্র্যাডিশনের মানুষরা আজ পর্যন্ত প্রশ্ন তুলতে পারলেন না, কার কোন চক্রান্তে একের পর এক খলিফা নিহত হলেন? সেই চক্রান্তকারী কে? প্রশ্নহীন ট্র্যাডিশনের ভারবাহী জনতা হাদিসি কাণ্ডকারখানায় অতীতচারী! সেই অতীতচারী প্রথাসর্বস্বতাকে প্রশ্নহীন আনুগত্যে মেনে নিয়ে গোটা সমাজে তার জোরপূর্বক পলিটিক্যাল আধিপত্য-টার নাম কোথাও তালিবান, কোথাও আইসিস! যেখানে তা হওয়া যায় না, সেখানে পুরুষ প্রধান অর্থোডক্সি!

এই হল কাণ্ড! এই কাণ্ডকারখানায় দর্শন বিযুক্ত কতগুলি প্রথাপালনের ধ্বজাধারীরা বিশ্বব্যাপী ইসলামের সোল স্পোকপারসন! ট্র্যাডিশনের উপর রঙ চমক লাগানো নানান রক্ষ ইন্ধনী কাণ্ড একের পর এক ঘটে চলেছে। পশ্চিমা প্রচারে সেই রঙ চমক লাগানো সোল স্পোকপারসন কখনো আলকায়েদা, কখনো আইসিস আবার কখনো বা তালিবান! যে চমকের সাথে অস্ত্রের যোগে মানবতা হননী কত না অপকাণ্ড!

এই অপকাণ্ডগুলি না করলে ইসলামের আর্থসামাজিক প্রযুক্তি গবেষণার দ্বার উন্মোচন হলে রক্ষণকামিতা ধরা পড়ে যাবে! তা কি হতে দেওয়া যায়? যায় না। বলেই আইসিস উৎপাত বন্ধ হতেই তালিবান আবার যেন কোন ঝুলি থেকে বেরিয়ে পড়লো!

# "মুসলিম মেয়ে প্রথম হয়েছে"— বলেছেন। বেশ করেছেন!

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল ঘোষণা করতে গিয়ে বলেছেন "একটি মুসলিম মেয়ে প্রথম হয়েছে"। ব্যাস! আর কোথায় যায়? আমাগো 'পোগোতিশীলতা', 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সব গেল রসাতলে! ব্রাহ্মণ্যবাদ যত না চিৎকার করে তার চেয়ে বেশি করতে লাগলো তার তলায় 'পোগোতিশীল' সাজা চিকন মুসলমানরা। কী হল? এদের যুক্তি কী?

মূল যে কথা এরা বলল তা হল সভাপতি ছাত্রীর ধর্মের কথা তুললেন কেন? তাকে বলতে হবে ছাত্রী বা ছাত্র। এতে শিক্ষা কলুষিত হল। সাম্প্রদায়িক তোষণ হল ইত্যাদি!

বিজেপির সর্বভারতীয় আইটিসেল ম্যানেজার অমিত মালব্য টুইট করে এই তোষণের অভিযোগ তুললেন। তাতে আরো সুবিধা হল! বামপন্থীরা আরও উঠে পড়ে লাগল।

সোশ্যাল মিডিয়ায় খুব সমালোচনা হল। মেয়েটি ও তার বাবা মা বলল, ধর্ম না উল্লেখ করলেই ভাল হত।

চাপের মুখে সংসদ সভাপতি 'আবেগে বলে ফেলেছি' এমন মন্তব্য করেছেন।

সরকার সভাপতিকে ভর্ৎসনা করছে। সম্ভবত ঐ পদে ভদ্রমহিলার থাকা আর হবে না!

এই হল কাহিনি।

এবার একটু আসা যাক বিশ্লেষণে।

১) সভাপতি ফল প্রকাশ কালে তপশিলি জাতি, আদিবাসী, উর্দুভাষী, হিন্দিভাষী, মাইনোরিটি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের পাশের হার পৃথক ভাবে উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে কেউ কিন্তু তার সমালোচনা করে নি। কেন করে নি? উল্লিখিত বর্গ পিছিয়ে পড়া। তাদের কতটা শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন হল সেইটা জানানোর কারণে তিনি তা উল্লেখ করেছেন। তাই সমালচনা হয় নি। বেশ কথা। সেই একই যুক্তিতে একটি মেয়ে প্রথম হয়েছে এবং মেয়েটি মুসলিম এই কথা বললে মহাভারত কেন অশুদ্ধ হল?

২) রুমানা সুলতানা ভারতীয়। রুমানা সুলতানা বাঙালি। রুমানা সুলতানা মুসলিম। এই তিনটি রুমানা সুলতানার আইডেনটিটি। কোনোটিই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

মুসলিম আইডেনটিটির লোকেরা শিক্ষা-স্বাস্থ্য-চাকুরি ইত্যাদি নানান আর্থসামজিক বিষয়ে পশ্চাদপদ। এই পশ্চাদপদতার দায় শাসকদলগুলো অস্বীকার করতে পারেনা।

মেজরিটি সেকটরের কাছে যা কিছু খারাপ তার ভার বহন এই মাইনোরিটিরা করে। খুন-জখম-রাহাজানি-দাঙ্গা-ধর্ষণ কী নয়! এবং সেগুলি মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়ায় উদবাহু প্রচারণাও পায়। সেই নেতিবাচক প্রচারের বিপরীতে রুমানার প্রথম হওয়া যদি তার ধর্ম-ধারণার সেক্টর কে একটু জাতে তোলে ক্ষতি কী?

সেই মাইনোরিটি রিলিজিয়াস আইডেনটিটি উল্লেখ করে তাদের অগ্রগতির বিজ্ঞাপন যদি কোনো শাসকদল দিতে চায়, ভালো কথা। এতে এত গেল গেল রব ওঠার কারণ ঘটেনি। তাতে ওই সেকটরের উন্নয়ন হাইলাইটেড হচ্ছে। বেশ কথা। সরকারের ঘোষিত নীতি তো পিছিয়ে থাকা শ্রেণি ও বর্গের উন্নয়ন। তাহলে?

৩) স্পর্শকাতরতা কোন কর্ণার থেকে এল? ভারতীয় জনতা পার্টি এর সমালোচনা করবে, একে তোষণ বলবে এটি খুব স্বাভাবিক। কারণ এটাই এই দলটির স্বরূপ। সে সবসময় মেজরিটি তোষণ করে। তাই সামান্য সুযোগ পেলেই বাকিদের বিরুদ্ধে মাইনোরিটি তোষণের অভিযোগ আনে।

কংগ্রেস নিজে আইডেন্টিটি পলিটিক্স করে। আজ থেকে নয় বহু যুগ থেকে। তার গেল গেল শোভা পায় না। অধীর বাবু গেল গেল করছেন। বামরা আইডেন্টিটি পলিটিক্স করে। গেল গেল করার নৈতিক অধিকার নেই।

শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস আইডেন্টিটি পলিটিক্স করে। তাদের নিজেদের এত ঘাবড়ে যাবার কারণ কী? আসলে মেজরিটি ভোট হারাবার ভয়?...

৪) এবার একটু ভিন্ন পার্টির কথা বলা যাক। আসলে সে-ই এই সবের নেপথ্যে। ব্রাহ্মণ্য বর্ণবাদ! সে দলিত শুদ্র মাইনোরিটি পিছড়ে বর্গ--- এদের প্রাগ্রসরতা সহ্য করে না। তাই এত গেল গেল! এই বর্ণবাদের চোরাস্রোত বাংলার সংস্কৃতি-রাজনীতির নিয়ন্ত্রক! আজও! অতি সযতনে আমাগো বামপন্থীগণের লালন পালন লাভ করিয়াছে। তাই জন্যই এত গেল গেল রব! এই বর্ণবাদ এমনই এক ইনসিকিউরিটিতে ভোগে যাতে করে তার আসন সামান্য টলেছে মনে হলেই হাউ হাউ শুরু করে দেয়। এক্ষেত্রে এটিই হচ্ছে।

৫) 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বললেই তো হয় না। কথার কথা বলা হয়। সিলেবাস পড়াশুনো স্কুল খেলার মাঠ সর্বত্র ধর্ম-ধারণার সগর্ব উপস্থিতি! সমাজের অন্তরমহলের

পরতে পরতে সাম্প্রদায়িক ভাবনার প্লাবন। বাঙালি হিন্দুর ঘরে ঘরে আরবি নামের লোক সম্পর্কে মুসলমান শব্দের ব্যঙ্গাত্মক উচ্চারণ খুব অপ্রতুল কি?
মহানগর বা জেলাসদর শহরগুলিতে বাড়িভাড়া পাওয়ার ক্ষেত্রে কী অবস্থা হয়? ধর্মনিরপেক্ষতা!
মুম্বাই-কলকাতায় পরিচারিকার কাজে মুসলিম মেয়েরা নাম পালটে নবনীতা, শ্যামলী হয়ে গৃহে আসে কেন?
অফিসে কলিগদের মধ্যে 'মুসলিম হলেও প্রগতিশীল' বা উনাকে 'মুসলমান বলে মনে হয় না' শব্দ বন্ধের তাৎপর্য অবধান করুন হে ধর্মনিরপেক্ষতা!
আর ফিরিস্তি বাড়িয়ে লাভ কী! এই হল ধর্মনিরপেক্ষতা! ওটি বইতে লেখা থাকে! সমাজের অনুশীলন উল্লিখিত ঘটনা সহ আরও অসংখ্য ঘটনা!
যা নাই তা আছে ধরে হাহুতাশ কেন? আসলে হাহুতাশ নয়। বর্ণবাদী এজেন্ডা গোপনে রেখে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দের আড়ালে 'অপর'কে মেইনস্ট্রিম মেইনফ্রেম মেইনট্রেন্ড হতে দেবে না। এই কাণ্ড! হ্যা, এটাই কাণ্ড!
৬) এবার প্রশ্ন তোলা যাক সেকটারিয়ান ধর্ম-ধারণা আর তার লাশ-বহন করা নিয়ে। ট্র্যাডিশন আরবী-ফার্সি শব্দ বা বাংলা শব্দের অনুষঙ্গেও আসছে। সেই ট্র্যাডিশন নিয়ে প্রশ্ন তোলার 'প্রগতিশীলতা' দেখাবার ধক আছে কারুর? নেই। অথচ প্রগতিশীলতার ভড়ং!
ইসলামিক ফিলসফিকে 'ধর্ম' এর কারাগার থেকে বের করার কথা হোক। ভারতীয় জীবন ধারায় অনুশীলিত জীবন দর্শনের নির্যাসকে আচার-প্রথা-ধর্ম-ধারণার কুহক থেকে বের করার কথা হোক। মানবতা বিরোধী প্রথা-রূপী ধর্মের কবরের উপরই একদিন নিশ্চয় মানব জাতির সেই কাঙ্খিত আত্মপরিচয় গড়ে উঠবে। যেখানে সেকটারিয়ান কোনো ধর্ম-কারাগার ঠাঁই পাবে না। তার আগে দরকার আদ্যন্ত বাঙালি আধুনিক সেই লোকটির জীবনকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখা। যাকে আমরা ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ হিসেবে জানি! তিনি রাজা রামমোহন রায়।

---

### ওয়েব সিরিজ রিভিউ

## মহানগর: শঠে শাঠ্যং প্রকল্প

রক্ষণকামী পলিটি চলেছে তার মত। শ্রেণি বিত্ত ইত্যাদি। আপার লোয়ার মিডিল। পলিটিক্যাল ক্ল্যাস। অপরাধ। প্রভাবশালী-প্রশাসন। নেক্সাস। রাতের মহানগর। এই তো চেনা মহানগরীরর রূপকথা। কুশিলব পাল্টে যায়। ছক একই থাকে। উপমহাদেশীয় মহানগর। ঢাকা-কলকাতা-মুম্বাই-দিল্লি ফারাক নাই। ঐ যে বললাম কুশিলব পালটে যায় ছক একই! সেই একলেঘেঁড়ে একবগগার মাঝে পরিচালক আশফাক নিপুন আমাদের নিয়ে গেলেন দেখালেন সেই চেনা ছক ভাঙার শিল্প ও মুন্সীয়ানা! মহানগর ওয়েব সিরিজ প্রথম পার্ট। আট পর্ব। হৈচৈ ওটিপি প্ল্যাটফর্মে।
উল্লিখিত পলিটির যাবতীয় সন্দর্ভের রচয়িতা সর্বশক্তিমান (!) রক্ষ। তার ইচ্ছায় বাঁচা তার ইচ্ছায় মরা। তার ইচ্ছায় আইন। তার ইচ্ছায় কানুন। এহেন ইচ্ছাধারীর রাজত্বে রাতের ঢাকার মোহময়ী জলসায় সেই ইচ্ছাধারীদের অন্যতম প্রভাবশালী রাজনীতিক পুত্র আলমগীর চৌধুরি। পার্টিতে ইচ্ছের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও পরবর্তীতে রাস্তায় হিট এন্ড রান করে নিরীহ পথচারী খুন। থানা পুলিশ আটক। পরের ঘটনার সেট সদর কোতোয়ালি থানা।
ওসি হারুন উর রশিদ, এস আই মলয় কুমার আর সহকারি পুলিশ সুপার শাহান হুদা।
এই সব ক্ষেত্রে যেটি হয়। অতি দ্রুত তৎপরতায় থানা থেকেই অভিযুক্ত প্রভাবশালী খালাস হয়ে যায়। ফোন। টাকার ব্যাগ। নেগশিয়েশন। ব্যবস্থাপনা। কোথাকার কোন কারখানা শ্রমিক সাইকেল আরোহীর মৃত্যু কার কী বা এসে যায়? কিন্তু সেট সেই সব নিয়ে রেডি থাকলেও ওসি হারুন তার প্রতিটি ব্যাপার অত্যন্ত সুচারু ব্যবহারে সেই প্রভাবশালীদের হাতিয়ারে তাদের জালে আটকে অভিযুক্তকে আদালতে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হন।
কিন্তু নিজ সহকর্মীর কাছে হয়ে যান অসৎ ঘুষখোর। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে গ্রেফতার অত:পর।
সততা অসততা সত্য মিথ্যার যে রক্ষণকামী সংজ্ঞায়নে আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস সেইখানে হারুন রশিদের মত মানুষের কার্যকলাপ বড্ড বেশি করে অভিনিবেশ দাবি করে দর্শক-শ্রোতা-পাঠকের। কারণ আর্থসামাজিক রক্ষের খপ্পরে পড়ে খাবি খেতে খেতে কেবল তার ডিফেন্সিভ মোকাবিলায়য় পথ নয়। সেই মোকাবিলা রক্ষের জাল ছিন্ন করে তার জন্য জাল পেতে সেই জালে তাকে জড়িয়ে পরাজিত করা। সেই কাজটি অত্যন্ত সুচারু মুন্সিয়ানায় করতে সক্ষম হয়েছেন ওসি হারুন।
কিন্তু রক্ষের বাঁধানো রাস্তায় চলা সাব ইন্সপেক্টর মলয় বা উচ্চ অফিসার জাকিয়া বারি মম তা ধরতে পারেন নি। এককাঠি এগিয়ে মলয় হারুণকে ধরিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশ পুলিশের Detective Branch এর হাতে।

আবহ নির্মানে চরিত্র চিত্রায়নে ও চরিত্র ফুটিয়ে তোলায় যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কুশিলব গণ। তবে ওসি হারুনের চরিত্রে সব্বাইকে অতিক্রম করে গেছেন মোশাররাফ করিম।

ওয়েব সিরিজটার দোষের জায়গা প্রতিটি চরিত্রের অনাবশ্যক যথেচ্ছ স্মোকিং! আর স্ল্যাং এর ব্যবহার। স্ল্যাং নিয়ে ছুঁৎমার্গ নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে পরিচালক প্রচলিত ফটোগ্রাফিক ছকে সমাজকে ধরতে গিয়ে এই কাণ্ডে জড়িয়েছেন।

আপার ক্লাস চিত্রায়ন আরো বিশ্বাস্য হওয়া দরকার ছিল।

থ্রিলার হিসেবে চার্ম ততটা না থাকলেও মুশাররাফ করিমের অভিনয় খামতিগুলি পূরণ করে দিয়েছে। সহ অভিনেতাদের অভিনয় জাকিয়া মম বাদ দিয়ে বাকিরা সব্বাই স্ব স্ব ভূমিকা পালন করতে পেরেছেন।

আবহ সংগীত উল্লেখ্যোগ্য নয়।

---

# দাসত্ব আখ্যান: ই-কমার্স ডেলিভারি বয়!

"আমরা দাস! আমদের কাজের নিশ্চয়তা ও মজুরি নিয়ে বলার কেউ নেই। নিজেরা বললে সঙ্গে সঙ্গে ছাঁটাই!

—ইউনিয়নের অধিকার নেই।

—যখন খুশি ওয়েজ কমাচ্ছে, কিছু করার নেই। সরকার আমাদের ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা নেয় না!

—অমানুষিক খাটুনি। ১২ ঘন্টার কর্ম দিবস! আমরা এখন বুঝতে পারি ৮ ঘন্টা কাজের মর্মার্থ!

—আজ আছি, কাল নেই!

—ওরা ফলাও করে সাইটে লিখে রেখেছে আমরা নাকি তাদের পার্টনার! ডেলিভারি পার্টনার!"

উদ্ধৃতাংশের সংলাপ স্যুইগি, যোম্যাটো কোম্পানির কয়েকজন ডেলিভারি কর্মীর!

একটু বিশদে যাওয়া যাক:--

১।।

একটু স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডাটা নিয়ে দুচার কথা। আমেরিকার মোট শ্রম-শক্তির ৩৪% অর্থাৎ প্রায় ৫.৫ কোটি লোক এই ই-কমার্স সেক্টরে কর্মরত। দিন কে দিন এর বাজার ও বাজার মূল্য বাড়ছে। ( সূত্র: দ্য ওয়ার)।

ভারতে Assocham এর হিসেবে আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে এই ক্ষেত্রের বাজার মূল্য দাঁড়াবে $455 বিলিয়ন। বর্তমানে এই ক্ষেত্রে ভারতে কর্মরত মানুষের সংখ্যা প্রায় ২৫ কোটি! ( সূত্র: দ্য হিন্দু, মার্চ,২০২১)। এই কর্মীদের ৭০% টেম্পোরারি এবং বাকি ৩০% পূর্ণ সময়ের। এদের মিনিমাম মাসিক মজুরি ৮৫০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ মাসিক ১৩০০০ টাকা (দিল্লি)। ( দ্য হিন্দু, বিজনেস লাইন)

২।।

কেউ মনে করতে পারে ব্লু-গ্রে কলার জব! স্যুইগি, যোম্যাটো! অ্যামাজন! ফ্লিপকার্ট! বিগ বাস্কেট! সপক্লুজ! প্রস্তুত স্ন্যাক্স/ পারসেল/ বিভিন্ন আইটেম কাস্টমারকে পৌঁছে দেবার কাজ। ডেলিভারি বয়! অনলাইন সিস্টেমে সাইন আপ! আই ডি! লগ ইন করেই অর্ডার নেয়া। মোটর বাইক! তেল। রিপেয়ার। নিজের।

১২ ঘন্টা খাটুনি। ৭০০-১০০০ টাকা আয় মাইনাস ৪০০ টাকার তেল। মানে সাকুল্যে ৩০০-৪০০ টাকা পার ডে! ইয়েস। (এখনকার হিসেবে)।

৩।।

মে-দিবস একটা হাস্যকর ব্যাপার হিসেবে এই প্রজন্মের কাছে চিত্রিত করা হয়েছে। ১৮৮৬ সালের ১লা মে শিকাগোর রাস্তায় শ্রমজীবি-মানুষের অধিকারের দাবীকে গুলি চালিয়ে দমিয়ে দিতে পারে নি। রক্ষণকামকে সেই দাবী মানতে হয়েছিল। ইউনিভার্সাল শ্রম-ঘন্টাকে ৮ ঘন্টায় বেঁধে দিয়ে। এটি একটি বিরাট জয় ছিল মানতার। এ জয়ের তাৎপর্য আজকের দিনে যোম্যাটো, স্যুইগি, অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট প্রভৃতি কোম্পানির ডেলিভারি বয় নামক 'আধুনিক দাস'দের মজুরী আর শ্রমঘন্টার হিসেব নিলেই মালুম পাওয়া যায়!

৪।।

রেলের বিভিন্ন স্টেশন কেন্দ্রের মুটে-মজুরদের নিজস্ব ইউনিয়ন রয়েছে। কুলি মজুরদের ইউনিয়ন আছে। কিন্তু আজকের রক্ষের স্কুল-কলেজে পড়াশুনো জানা চিকন ভাষা বলতে পারা এই সব ই-কমার্স মজুরদের ইউনিয়ন নেই। থাকতে নেই, গড়তে চাইলে ছাঁটাই হবে! এদের কষ্ট-দু:খ যন্ত্রণার কথা 'নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক' বা নাম প্রকাশ করলে যাতে তাদের কাজ না চলে যায় সেই কথা মাথায় রেখে সাংবাদিককে করতে হচ্ছে। ( সূত্র: নিউজ লন্ড্রির সাংবাদিকের লেখা)।

৫।।

ভরা লকডাউনে যখন শহুরে নাগরিক এদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জিনিস পেয়েছেন তখন এদের মজুরী

কমেছে। কেবল শহর নয়। টাউন ও গ্রামীন এলাকার ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম নেই।

ফ্লিপ কার্টের সাথে যুক্ত এরকম দুজনকে দেখলাম বাধ্য হয়ে জীবিকা পাল্টাতে। এদের একজন গ্রামীন দোকানে বিস্কুট ডেলিভারির স্বাধীন ব্যবসা খুলল। আরেক জন অনুরূপ কিছু!

৬।।

প্রথমোক্ত দুই কোম্পানি তাদের সাইটে এইসব ডেলিভারি বয়দের তাদের কোম্পানির পার্টনার হিসেবে উল্লেখ করে রেখেছে! কী প্রহসন! যাদের কাজের কোনো ঠিক ঠিকানা নেই! তারা হল গিয়ে পার্টনার! তাদের নামের সাথে কত শতাংশ ডিভিডেন্ট যোগ করে কত শতাংশ ট্যাক্স ফাঁকি হয়েছে তাই বা কে বলতে পারে!

৭।।

কোম্পানিগুলির বাৎসরিক টার্নওভার এবং প্রফিটের হিসেব নিলে কী দেখছি। বিশ্বব্যাপী প্রায় মনোপলিতে এরা ব্যাবসা করছে। অথচ লোয়ার গ্রেড এই মজুর কাম দাসদের কথা তাদের মনে হয় না!

হয় না, সেকথা মার্কস নামক সেই জার্মান লোকটা মানব জাতিকে জানিয়েছিল, সেই কত বছর আগে!

৮।।

এই সব নব্য 'দাস' প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-প্রতিকার জানে না! জানে না কী? ধক নাই! একটা মুটে মজুরের যে ধক আছে, এদের নেই! একটা কুলি মজুরের যে ধক আছে এদের নেই! কেন?

৯।।

স্বাধীনতার ৭৫ বছর হয়েছে। কীসের স্বাধীনতা! বহুজাতিক কোম্পানির কর্মী শোষণের বিরুদ্ধে বলতে পারে না! কীসের স্বাধীনতা ভাই! কেন বলতে পারছেন না? এত ভয়? এত ধ্বজভঙ্গ, পৌরুষ কই গেল!

১০।।

পলিটিকাল ক্লাস এর উত্তর কী? তোমাদেরও দিতে হবে জবাব! কারণ প্রজন্মকে শক্তিহীন, রাজনৈতিক চেতনাহীন করেছো দিনের পর দিন তোমরা শাসক শ্রেণিকে তুষ্ঠ করতে! আসল সমস্যা? রাজনৈতিক চেতনা! ইয়েস!

১১।।

... যে রাজনৈতিক চেতনাহীনতা শোষণ এর বিরুদ্ধে কথা বলার ভাষা জানে না! সেই একই রাজনৈতিক চেতনাহীনতা 'সেনাশাসনের' রোম্যান্সে ভরপুর হয় খুব সহজেই! প্যারামিলিটারি দিয়ে দেশের সীমান্তবর্তী ৫০ কিমি রেডিয়াস ঘেরাটোপ করার মানে এরাই বুঝতে পারে না! এরাই হল তারা যারা আসলে শক্ত শাসক দরকার ছিল মনে করেছিল! এরাই তারা যাদেরকে হিন্দু-মুসলিম বাইনারি দিয়ে সহজেই কাবু করা যায়! এরাই তারা যাদেরকে 'আজ তো প্রতিবাদ করছো কাল করনি কেন'র উদ্ভট কু-যুক্তি গেলানো যায়! এরাই তারা যাদেরকে পোস্ট ট্রুথ অর্থাৎ সত্যই মিথা কিম্বা মিথ্যাই সত্য এই উদ্ভুট্টি গেলানো যায়!

আর এটা করা যায় তাদের মানবিক বস্তুত্বকে শেষ করে অর্থাৎ রাজনৈতিক চেতনা গড়ে উঠতে না দিয়ে! আদর্শহীন করে!

আর সেটা করা যায় নেশা— যৌনতার বিশৃঙ্খলায় তাদের ডুবিয়ে দিয়ে!! তাহলে??

এটাই শেষ কথা নয়! রাতের আঁধার গাঢ় হচ্ছে বলে ভোর হবে না, বা সূর্য উঠবে না এটা সত্য নয়! তরুণ যুবদের আমিত্বিক আত্মপরিচিতি গড়ে উঠলেই রক্ষণকামিতার রেহাই নেই! না, না ধর্ম নয়, কাস্ট নয় বস্তুভিত্তিক সেই মানবিক আত্মপরিচিতি গড়ে তুলেই আজ বা কালকের তরুণ-যুবরা অন্ধকারের কারবারিদের চিহ্নত করবেই করবে!!

[ একটি ভাল খবর গত মার্চ ২০২১ এ অ্যামজন এর ডেলিভারি সেকশনের কর্মিরা প্রায় ১০০০০-২৫০০০ জন মজুরি হ্রাসের বিরুদ্ধে একদিনের প্রতীকি ধর্মঘট পালন করে। তারা The Indian Federation of App-based Transport Workers( IFTA) গঠন করতে সক্ষম হয়েছে। ( লাইভ মিন্ট) ]

## সিপিএম:কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট

রিপোর্টটি পার্টির ওয়েব সাইটে আপলোডেড হয়েছে। রিপোর্টের তারিখ ৬-৮ আগস্ট ২০২১। এরকম ঘটনা আগে ঘটেনি। কেন্দ্রীয় কমিটির রিভিউ রিপোর্ট ডাইরেক্ট পাবলিক করে দেওয়া হল। ইন্টারেস্টিং! এবং স্বাস্থ্যকর!

### প্রাথমিক কথন

১। ভোটের ফল ডিভাস্টেটিং। ভয়ানক বিপর্যয়কর। স্বাধীনতার পর সবচেয়ে বড় পরাজয়। সিরিয়াস আত্মসমালোচনা প্রয়োজন। কারণ পার্টির গৃহীত অনেক রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত মানা হয়নি।

২। রাজ্যের জনতা বিজেপিকে পরাজিত করেছে। এই জন্য তাদের স্যালুট।

৩। বিজেপি পরাজিত হয়েছে। তাদের কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ হাইপ্রোফাইল নেতাদের প্রচার, মিডিয়া আধিপত্য সত্ত্বেও। তারা বাংলা দখল করতে চেয়েছিল। জনতা প্রতিরোধ গড়েছে। বিকল্প হিসেবে তৃণমূলকে বেছে নিয়েছে। সংযুক্ত মোর্চাকে করেনি।

৪। ২০১৯ ইলেকশন পর্ব থেকেই TMC-BJP বাইপোলার পলিটিক্যাল ফ্যাকটর বহমান। অন্য রাজনীতির স্পেস সংকীর্ণ।

৫। ২০১৯ এ উঠে আসা রাজনৈতিক শক্তিগুলির আন্তঃসম্পর্ক অপরিবর্তিত থেকেছে। আমরা তা পালটাতে পারিনি।

কেন পারলাম না? এর উত্তর দিতে হবে-

## ইস্যুভিত্তিক যা নিম্নরূপ:

**ক) গণভিত্তির ক্ষয়ঃ** ২০০৮ থেকে শুরু হয়েছিল। ২০২১ এও অব্যাহতি মেলেনি।

পার্টি ও গণসংগঠন নানান আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তুলেছে। ১০ লাখ লোকের ব্রিগেড করেছে। কিন্তু ভোটে তা প্রতিফলিত করতে পারেনি। তার কারণ নিচের দুটি পয়েন্ট।

**খ)** দেশব্যাপী দক্ষিণপন্থার অভ্যুত্থান সম্পর্কিত উপলব্ধির ঘাটতি। ২০১৪ পরবর্তী সময়ে আরএসএস এর কার্যকলাপ রাজ্যে বৃদ্ধি। কেন্দ্রে মোদির আক্রমণাত্মক হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন। উগ্র জাতিয়তাবাদের জোয়ার। সম্যক ধর্তব্যে আসেনি।

**গ)** মুক্তবাজারী অর্থনীতির পরিণামে সমাজে শ্রেণিগত সিফটিং যা আখেরে পার্টি সংগঠন, তার স্লোগান তার কৌশল সবকিছুকে প্রভাবিত করেছে। এইটি ধরতে না পারা। যার ফলে গরীব-প্রান্তিক মানুষ পার্টির থেকে দূরে সরে গেছে।

**ঘ)** TMC-BJP এর মধ্যে রাজ্যের রাজনৈতিক মেরুকরণ। এই মেরু ভাঙা যায়নি। এই মেরুকরণের অনেক কারণ। কিন্তু তা 'দিদি-মোদি সেটিং' নয়। দীর্ঘ অতীত সম্পর্ক থাকলেও আগ্রাসী হিন্দুত্বের বর্তমান রূপের প্রচন্ডতায় TMC তাদের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। বাংলা দখল করতে চেয়েছিল বিজেপি।

নির্বাচনের আগে ও পরে দলবদল ব্যাপারটি থেকে সেটিং এর ভুল ব্যাখ্যা এসেছে।

মোদি-শাহ এর রাজ্য জয়ের তিন প্রধান স্ট্র্যাটেজি- ১) টাকা /পদ ইত্যাদি দিয়ে লোক/নেতা কেনা। ২) আইন প্রয়োগকারী সংস্থা দিয়ে ভয় দেখানো। ৩) মিথ্যা কেস ও জেল।

রাজ্যে সবকটি চাল তারা চেলেছিল। TMC-BJP এর বিরোধকে তবু underestimate করা হয়েছে। যাতে BJP-TMC কে এক করে দেখার ভুল ঘটেছে। মানে এখান থেকেই বিজেমূল থিয়োরি এসেছে। পার্টির নির্বাচন পূর্ব সিদ্ধান্ত ছিল বিজেপিই প্রধান শত্রু। সেটি মানা হল না। পার্টির সেকুলার ইমেজ ধাক্কা খেল।

**ঙ)** TMC এর প্রতি জনতার প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার মনোভাবকে বাড়িয়ে দেখা (Overestimation)। কিন্তু তা কাটিয়ে উঠতে তারা যে অনেক মিজার নিয়েছে তা দেখতে না পাওয়া। যেমন-

(১)এই মিজারের অন্যতম নানান জনকল্যাণকারী পদক্ষেপ। যা জনগণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রিলিফ ছিল। কিন্তু আমরা সেগুলিকে ঘৃণাভরে 'ডোল পলিটিক্স' বলে ব্যঙ্গ করতে থেকেছি। এতে জনগনের থেকে পার্টি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

(২) মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি ব্যক্তি আক্রমণ। প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। নন্দীগ্রামে তার আঘাতের পর সহানুভূতি একটি বিষয়।

(৩) শাসক দল বিভিন্ন সামাজিক গ্রুপের জন্য বিভিন্ন মিজার নিয়েছে। যার সুফল তারা পেয়েছে।

উল্লিখিত বিষয়গুলি উপলব্ধি করতে না পারা।

## চ) জমির প্রশ্ন

নন্দীগ্রাম সময়কালের জমি-নীতির স্মৃতি ভোট পর্বে উসকে যাওয়া। কৃষি ভিত্তি, শিল্প ভবিষ্যৎ স্লোগান পুনরায় ব্যবহার করা। বিশেষ করে যখন কৃষক কৃষি আইনের বিরুদ্ধে লড়ছে। MSP এর জন্য লড়ছে। তখন এই স্মৃতি গ্রামীন প্রান্তিক মানুষকে আরো একবার পার্টি থেকে দূরে সরিয়েছে।

## ছ) আইডেন্টিটি পলিটিক্স

সাচার কমিশন মাইনোরিটি উন্নয়নে তিনটি কথায় গুরুত্ব আরোপ করেছিল। ১. সিকিউরিটি (নিরপত্তা) ২. ইক্যুইটি (সমতা) ৩. আইডেনটিটি (পরিচিতি)। আমরা আমাদের পিরিয়ডে সিকিউরিটি নিশ্চিত করলেও বাকি দুটি সূচকে পিছিয়ে ছিলাম। কর্ম সংস্থান, আত্মপরিচিতির প্রশ্ন গুরুত্ব পায়নি।

(পরবর্তী অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়)

আলোকপাত

# আধিপত্য কাকে বলে?

নিকোলাই

## কয়েকটি উদাহরণ—

১। 'ধর্ম' নিয়ে কী ভাবছো?.. 'আমি' বা 'আমরা' যে মাত্রা টেনে দেব তার মধ্যেই ভাববে।

২। 'অর্থনীতি' নিয়ে কী ভাবছো?... এ শাস্ত্রে 'আমাদের' বশংবদ অধিকার! মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ করতে এসোনা।

৩। যৌন-জীবন অর্থাৎ প্রেম ও দাম্পত্য নিয়ে কী ভাবছো?... 'আমরাই' ঠিক করে দিচ্ছি। কোনো সমস্যা নেই সেইভাবে চলবে!

৪। রাজনীতি নিয়ে কিছু ভাবছো নাকি?... খবরদার! বাকিগুলোর তবু কিছু ছাড় আছে। এটার বেলা কোনো ছাড় নেই! জিরো টলারেন্স! সাবধান!

৫। তুমি কোন পক্ষে? জেনে রাখো যদি 'আমার' বা 'আমাদের' পক্ষে না থাক তাহলে তুমি অতি অবশ্যই শত্রু-পক্ষ! কারণ 'আমি' বা 'আমরা' জানিনা- মানিনা- মানবোনা যে অন্য কোনো তৃতীয় প্রতিবাদী কণ্ঠ থাকতে পারে! ইহাই জর্জ বুশের যুক্তি ছিল!

৬। ভাল-মন্দ, নীতি-দুর্নীতি, ঠিক-বেঠিক, সামাজিক-অসামাজিক এই সকল ব্যাপারের সংজ্ঞা 'আমি' বা 'আমরা' ঠিক করে দেব! তুমি কেহে এসব নিয়ে প্রশ্ন করার?

৭। সময়-সুযোগ-সিচুয়েশন এলে সেই ভাল-মন্দ, নীতি-অনীতি, ঠিক-বেঠিকের সেন্টিমেন্টে লুম্পেন বিশেষিত গণমানসকে কাজে লাগিয়ে নিন্দা ফুঁৎকারে জীবনকে ভাজা-ভাজা করতে 'আমরা' জানি!

অর্থাৎ

ক)- জীবন ও জগতের হেন কিছু নেই যার ব্যাপারে শেষ কথা বলার ক্ষমতা 'আমি' 'আমরা' রাখিনা! এই যে 'আমি' অথবা 'আমরা' বিশেষণের ব্যক্তি বা দল তা-ই হল আধিপত্যকামী!

এই আধিপত্য কী করে? সে শাসক শ্রেণির সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে। শাসক শ্রেণির কথা বলছি, শাসক দলের কথা বলিনি। দলরূপে সে ক্ষমতায় থাকুক বা না থাকুক! রাজনৈতিক ক্ষমতায় না থাকলেও সামাজিক পরিসরে এইসব করে সে অথরিটি বা কর্তৃত্ব ভোগ করে।

খ) এইভাবে আধিপত্যকামিতা যদি সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকে কব্জা করে ফেলে তাহলে সমাজের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যায়। ১/ স্বাধীনভাবে চিন্তা করার শক্তি হারিয়ে যায়। ২/ শ্রম ও মূল্যের হিসেব অর্থাৎ জীবন বোধ বা মূল্যবোধ গড়ে উঠে না। স্বাধীনভাবে চিন্তা করার শক্তি হারিয়ে গেলে লাভ হয় অপক্ষমতার। তাকে প্রশ্ন করার কেউ থাকেনা। সে তখন যা খুশি করতে থাকে। শ্রম ও মূল্যের হিসেব কষতে না জানায় লোকেরা বুঝতে পারে না তাদের সমস্যার কারণ কী। এই অবস্থায় ভাল-মন্দের সেন্সহীন এই যে জনপিন্ড তার চরিত্র হয়ে যায় পরনির্ভর, লুম্পেন বৈশিষ্টের। অর্থাৎ আধিপত্যকামিতা জনতার নাগরিক চরিত্র গড়ে উঠতে না দেবার জন্য তাদেরকে লুম্পেন বিশেষণে রাঙিয়ে দেয়।

উল্লেখ্য যে, আধিপত্য কোথাও ঘা খেলে সামাজিক লুম্পেন মেন্ট্যালিটিকে নানান সেন্টিমেন্টে সেই ঘা দেবার শক্তির পেছনে লেলিয়ে দিতে চেষ্টা করে।

যেমন- বয়সে 'বড়-ছোট'র সেন্টিমেন্টের দোহাই দেওয়া যার মধ্যে অন্যতম। এবং যা মার্কসীয় দৃষ্টিকোণে সবচেয়ে হাস্যকর! কিন্তু এরা জানে যে তা হাস্যকর। তবু করে কেন? কারণ সেটি না করলে সেই জনতার কাছে তাদের মান (Level) থাকে না, যাদেরকে সে একসময় তাঁবে রাখত, আধিপত্যের বন্ধনে বেঁধে রাখত! এ হল প্রলেতারিয়েতের লুম্পেন-প্রলেতারিয়েত বনে যাওয়া। যখনই প্রলেতারিয়েত শ্রেণি-চেতনা বোধহীন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সেন্টিমেন্টে অধ:পতিত হয় তখনই সে লুম্পেন চরিত্রভুক্ত হয়ে পড়ে। 'শ্রেণি-স্বার্থ, বিপ্লব, কালচার, প্রগতি'-- এই সব কথা তার অর্থ হারিয়ে ফেলে। সেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী জনতার উপর আধিপত্য-হারানোর ভয়ে সেন্টিমেন্ট্যাল হয়ে সেই আধিপত্যের পক্ষ্যে যাকে হুমকি মনে করে তাকে আক্রমণ করতে শুরু করে। সে বুঝতে পারে না এতে তার চরিত্র মার্কস কথিত লুম্পেন রূপ নিয়ে নেয়। তার মানে সমাজটি একদিকে কর্পোরেট আর্থনীতিক জাঁতিকল আর অন্যদিকে লুম্পেনি ঘেরাটোপ—এই দুই এর তলায় বন্দি। (রকমফেরে ফ্রান্স বিপ্লব পর্বগুলিতে এই লুম্পেনকে সজ্জিত করেই লুম্পেন সরদার সেজে বোনাপার্ট ক্ষমতা কব্জা করেছিল।)

প্রতিকারের তত্ত্ব কী? প্রযুক্তি কী?

এক কথায় তা জ্ঞান-বিশ্বাস-সংগ্রাম। যা অস্তিত্ব দর্শনের মৌলিক প্রতিপাদ্য। যা মার্কসবাদ সহ পৃথিবীর যাবতীয় ইজমের সমকালীন প্রায়োগিকতার ব্যাখ্যাতা।

## বোধোদয়

### রনিক পারভেজ

" নিজের পাড়ায় হলে সম্প্রীতি বেরিয়ে যেত বা দূরে ঘটেছে বলে ঠাণ্ডা ঘরে বসে বুঝতে পারছেন না" মার্কা কথা যারা এখনই বলবেন বা বলছেন তাদেরকে বলি, দূরে হোক বা কাছে, যেকোনো গোষ্ঠী-হিংসার ঘটনা সমান ভাবে ঘৃণ্য। নোয়াখালির ঘটনা যতটা ঘৃণ্যঠিক ততটাই ঘৃণ্য আসামের দারাং জেলায় মইনুল হককে পুলিশের নৃশংস ভাবে গুলি করে মেরে ফেলা বা ফটোগ্রাফার বিজয় বানিয়ার সেই শব দেহের ওপর লাফানোর অসহনীয় দৃশ্য! এই রকম উদাহরণ অজস্র। দুই পক্ষেরই মুখোশ এক, হিংসার ভাষা এক, শুধু নামগুলো আলাদা। তাই শারিয়া আইনের নামে আফগানিস্তানে মহিলাদের পোস্টারে পড়ছে কালো রং , প্রশ্ন করলে অথবা মুখ না ঢাকলে বন্দুকের বাঁটের বাড়ি, আর এদিকে রাজস্থান বা উত্তর প্রদেশের গ্রামে ব্রাহ্মণ পরিবারের কোনো নারী 'অস্পৃশ্য' এক পুরুষের সাথে প্রেম করলে তাদেরকে শিকার হতে হয় honour killing এর। Buddhism বার বার শান্তির কথা বলে। ধারণার খেলায় বাদ পড়ে নি সেও। সেখানেও বেরিয়ে এসেছে হিংসার ছবি। আমরা এই ধারণার খেলায় এতটাই অন্ধ যে এক বিরাট সংখ্যক মানুষ চোখের সামনে দেখেও প্রশ্ন করেনি CAA' তে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, খৃস্টান, পার্সিদের মধ্যে মুসলিম নাম কেন অনুপস্থিত।

এই হিংসার কোনো শেষ নেই। ইতিহাসের পাতা থেকে পৃথিবীর সব দিক থেকেই বেরিয়ে আসবে একের পর এক ভয়াবহ ঘটনা। শুধু চলতে থাকবে কথার পিঠে কথা এক অনন্ত রক্তের জমিতে!

নাগরিক হিসেবে আমাদের একটাই কর্তব্য: যুক্তিবোধ, শিক্ষা অর্থাৎ মানবতার সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের মধ্য দিয়ে আমাদের উপমহাদেশের বা বিশ্বের বৈচিত্রকে সংরক্ষণ করা। যেকোনো ধর্মের অন্ধত্বকে প্রশ্ন করা। প্রতিবাদ জানানো। আর মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের তৈরি করে দেওয়া ধারণার ফাঁদে পা না দেওয়া। কারণ সে ধারণাগুলি নানান ধরনের সেন্টিমেন্টে মানুষকে উসকে দেয় এবং আর্থসমাজকে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করে কলুষিত করে।

মানবতা বিবর্জিত অবচেতনা থেকে ঘটে যাওয়া নানা ঘটানার ইমপ্যাক্ট কী হয় তার দৃষ্টান্ত বারবার পৃথিবীর নানা প্রান্তে দেখা যাচ্ছে। ব্যক্তি সেন্টিমেন্ট রিফর্ম না করায় চেতনার বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। প্রশাসন শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা করছে। শান্তি শৃঙ্খলা বজায় যে খুব বেশিদিন থাকছে তা না নয়। কেন স্থায়ী হচ্ছে না, সেই দিকটি নিয়ে ভাবা দরকার।

নানা ভাষা, বর্ণ, জাতি, জনপদ ইত্যাদি নিয়ে সেন্টিমেন্ট খাড়া করা হচ্ছে। ব্যক্তি চেতনা চৈতন্য ফিরে পাক তা রক্ষ চায় না। তাই জ্ঞান গ্রন্থে সেই দিক-নির্দেশনা থাকলেও এডিশন-অমিশন ইত্যাদি নানান কাণ্ড করে তা মানুষের কাছে দুর্ভেদ্য করে দিয়েছে। পরিণামে সেই শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ করতে যাওয়া কাজের থেকে অকাজের হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাহলে উপায়? হাঁ, সেই কারণেই "অস্তিত্ব" দর্শন মানুষের সামনে হাজির হয়েছে। তা মানুষকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে না। আর্থসামাজিক উন্নয়ন এমনি এমনি সম্ভব নয়। সেইজন্য সংগ্রাম অর্থাৎ নিজ নেগেশনকে নেগেট করে অস্তি বা হাঁ মুখীন হতে হয়। অর্থাৎ প্রয়োজন ব্যক্তির চরিত্র গঠনের। নিজ অস্তিত্ব খোঁজে ব্রতী হলেই মূল্যের হিসাব কষার প্রযুক্তি পাওয়া যায়। কী করে কী করতে হয় তা প্রতিভাত হয় ব্যক্তির কাছে। শ্রমক্ষেত্র তৈরি হয়, মূল্য উৎপাদন হয়। মূল্য বিন্যাসের প্রযুক্তি নিয়ে মানুষ যখন একত্রিত হয় তখন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

এভাবে ব্যক্তি তথা সমাজ চরিত্রে গঠনমূলক সক্রিয়তা না থাকলে পূর্বে উল্লিখিত সেন্টিমেন্টের খেলায় মানুষকে ভাগ করে রক্ষের কাজ হাসিল বড্ড সহজ হয়ে যায়।

# বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

## ফিরোজ অনীক

"হিন্দু না ওরা মুসলিম? ঐ জিজ্ঞাসে কোন জন।
কান্ডারি বলো ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার "

- কাজী নজরুল ইসলাম

উপমহাদেশের দেশগুলোর অবস্থা সত্যি করুণ। স্বাধীনতা পরবর্তী কালে ব্রিটিশ বিভাজনের মন্ত্র আজ বিষবৃক্ষ। বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান তিনটি দেশেই ধর্মীয়-আফিম খোরদের বাড় বাড়ন্ত । সারা বিশ্বের উর্বর কর্পোরেট শোষণ-কল অব্যাহত রাখতে আফিম খেকো পঙ্কিল পঙ্গপাল লালন পালন ফলদায়ী। সেই শর্তে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে লুম্পেনাধিপতি তথা রাষ্ট্র প্রধান পোষা।

কাজেই সুযোগ্য নেতৃত্বাধীনে কোনো দেশ নেই। শ্রম চুরি অব্যাহত রাখতে কান্ডারি বিহীন ধর্মীয় লুম্পেন রাজে বিভাজন দাঙ্গা-হাঙ্গামা শেষ কথা। শিল্প কারখানা চাকরি বাকরিহীন দেশের এমন অস্থিরতা তৈরির সুবর্ণ সুযোগ কোন লুম্পেন একনায়ক শাসক মিস করে ?

যেখানে জব্বার-মাহাতাব, শ্যামাপদ-হরিপদরা শিক্ষা দীক্ষাহীন সেখানে খুব সহজেই তো কুমিল্লার মত ঘটনা ঘটিয়ে দেয় শকুনি নেতৃত্ব কিংবা বিরোধী দলগুলোর শেয়াল শকুনরা। এই শকুনি কারসাজিতে কত গুজরাত, কত বাবরি কত শত অপঘটনা ঘটে। ধন রক্ষায় শ্যামাপদ-জাব্বারদের লড়াই লাগিয়ে দেওয়া দেওয়া হয়।

### কুমিল্লা প্রসঙ্গ

কুমিল্লার ঘটনা তো পরিস্কার হয়ে গেছে। ঐ দেশের বাড় খাওয়া উদগান্ডু কোনো একটি মুসলিম গোষ্ঠী এই অপঘটনার জন্য দায়ী। সরকারি গোয়েন্দা ব্যর্থতা তো এই ঘটনার জন্য কম দায়ী না ।

হাসিনা সরকারের ইমিডিয়েট দাঙ্গা-হাঙ্গামাকারিদের গ্রেফতার করা উচিত। প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসিনা যে বিবৃতি দিয়েছেন তা অবিলম্বে কার্যকর করে দেশে শৃঙ্খলা ফেরানো উচিত। সংখ্যালঘুর জান মাল বাঁচানো সরকারের আশু কর্তব্য।

ভারতে উগ্র জাতীয়তাবাদী শক্তির ক্ষমতায় আসীন থাকা, আফগানিস্তানে বর্বর তালিবানের উত্থান, বাংলাদেশের বর্বর সন্ত্রাসী হেফাজতে ইসলাম, জামাতি ইসলামি সহ আর সমস্ত ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর আরো বেশি শয়তানি ও বর্বরতা বৃদ্ধি করেছে।

### পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি প্রসঙ্গ

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণে পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি মওকা পাচ্ছে। চিৎকার শুরু করেছে এইজন্য CAA, NRC এর কথা বলেছি। সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ হলে মাকু-সেকু বুদ্ধিজীবিরা পথে নামে। কিন্তু বাংলাদেশের বেলায় তারা চুপ কেন?

এইভাবে নানান কথা বলে সংখ্যাগুরুর ধর্মীয় সেন্টিমেন্টে উসকানি দিচ্ছে প্রতিদিন। রাজ্যের শাসকদলের পক্ষ থেকে বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে কোনো দেশই সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার সমর্থনযোগ্য নয়। বাংলাদেশের কুমিল্লার ঘটনায় এ রাজ্যের কোনো মদত আছে কিনা সেটাও দেখতে হবে। রাজ্যের বুদ্ধিজীবীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। তবু ধর্ম-ব্যাবসায়ীরা উত্তরোত্তর সেন্টিমেন্ট খোচানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

গত বিধান সভা নির্বাচনে পরাজিত হয়ে তারা এখনও ব্যাকফুটে। কোনো রাজনৈতিক নতুন ইশ্যু তৈরি করতে পারছিল না। কিন্তু ভরা পুজোর এই মরসুমে এমন একটি কাণ্ড তাদের অক্সিজেন যুগিয়ে দিল! যার অনুরণন পাওয়া গেল তাদের দলের এক নেতার কথায়! এই ঘটনার পরে নাকি উপনির্বাচনে তাদের ফল ভালো হবে! শুধু উপনির্বাচন না, ২০২৪ এর পার্লামেন্টারি নির্বাচনকে সামনে রেখে তাদের ঘুঁটি সাজাতে উক্ত অপঘটনা অনেকখানি সুবিধেই করে দিল।

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু সাম্প্রদায়িক অপশক্তির ধর্মের সুড়সুড়িতে ভোটভিক্ষাকে তীব্র আক্রমণ করেছিলেন। আগামী নির্বাচনগুলিতে যে এই কাণ্ড ঘটবে তাতে সন্দেহ নেই। প্রতিহত করার দায়িত্ব বাঙালির।

তারও আগে দুদেশের সচেতন মানুষদের সতর্ক থাকা ভীষণ জরুরি। যাতে ধর্ম ব্যবসায়ীরা নতুন করে আর কোনো অপঘটনা ঘটাতে না পারে।

# তরুণের আড্ডায়-১

## আব্দুল মোমিন

তথাকথিত রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য হরেন, অনুকূল, স্বপন এবং বাহাদুর গ্রীষ্মের সন্ধ্যেবেলায় মোড়ে একটি বেঞ্চ ও দুটি টুল নিয়ে দোকানের বাইরে রাস্তার পাশে বসে গল্প করছে। ঈদের দিন দশেক আগে হওয়ায় মোড়ে বেশ ভিড় রয়েছে। বাহাদুর গরমের কারণে লুঙ্গি উরু পর্যন্ত গুটিয়ে নিয়ে বেঞ্চের উপর পা তুলে বসে আছে। ডানপাশে অনুকূলও পা তুলে বসে আছে। হরেন জামা খুলে পায়ের উপর রেখে খয়েরি রংয়ের ফ্যাকাশে ঘামে ভেজা সেন্ডু গেঞ্জি পরে টুলের ওপর বসে আছে আর পা জোড়া সামনের দিকে এগিয়ে এক পায়ের গোড়ালির ওপর আর এক পা রেখে নাড়াচ্ছে। স্বপন জামা খুলে জামার দুই তৃতীয়াংশ পিঠের দিকে ঝুলিয়ে ডান কাঁধের উপর রেখে লুঙ্গি হাটুর উপর তুলে বসে পান চিবোচ্ছে আর মাঝে মাঝেই উন্মুক্ত উরুদ্বয় চাপড়াচ্ছে। স্বপনকে দেখে হরেনও থেকে থেকে চাপড়াচ্ছে। মিহির রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে দেখে হরেন হাক দিয়ে ডাকে।

—কিরে মিহির পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিস আমাদের চিনতেই পারছিস না (হাসতে হাসতে উন্মুক্ত উরুদ্বয় চাপড়ে বলল)। আয় আয় আমাদের একটু সময় দে।

অনুকূল মুখ বাঁকিয়ে হেসে মিহিরের দিকে তাকায় আর স্বপন মুখ ভর্তি পানের পিক পায়ের কাছেই ফেলে মুচকি হাসে। অনুকূল বেঞ্চ থেকে পা নামিয়ে হাত সরিয়ে ডানপাশে মিহিরকে বসার জায়গা করে দেয়।

মিহির কাছে এসে শান্তভাবে বলে, না! ওই সামনের চায়ের দোকানে যাচ্ছিলাম। করিম আজ্ঞা প্রাপ্তিবাচক দৃষ্টিতে অনুকুলের দিকে তাকিয়ে পা নাড়ানো থামিয়ে জিজ্ঞাসা করে, মিহির মাস্টারকে মাটি দেওয়ার সময় কবরস্থানে তোকে দেখলাম না। অনুকূল আবার মুখ বাঁকিয়ে নিঃশব্দে হাসে আর অন্যরা মিহিরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।

মিহির হাসির ছলে করিমকে জিজ্ঞেসা করে, মাটি কি সবাইকেই দিতে যেতে হয়? কাধেঁর জামা ঠিক করে রেখে পানের পিক ফেলে কিছু বলবে বলবে করছে। করিম উত্তর দেয়, না না সবাইকে দিতে হয় না। তাও!

স্বপন বলে, বুঝেছ মিহির কিছু মনে কোরো না। তোমাদের তপন সামাজিক নয়। কারো সঙ্গে কথা বলে না। মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে না।

মিহির এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে, এইভাবে তাকে আদর করে ডেকে বসতে দেওয়ার মানে! মিহির সংযত হয়ে বলে, এখানে তপনের নাম আসলো কেন আর তার সম্পর্কে আমাকেই বা জিজ্ঞেসা করছেন কেন? বাহাদুর স্বপনের কথা শুনে সঞ্জীবিত হয়ে হাসি হাসি মুখ নিয়ে বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়ায়। অনুকূল পা দুটি নামিয়ে শিরদাঁড়া সোজা করে বসে। করিম আবার পা নাড়াতে শুরু করে, ডান হাতের তর্জনী দিয়ে বড় লোম ভর্তি নাক ঘষতে থাকে।

মিহির বলে, তপন কেমন সে কথায় আমি যাচ্ছি না। কিন্তু আপনাকে নিয়ে একটু কথা বলা যাক। আপনি এই ৪ জন বাদে এবং বাজার করার উদ্দেশ্যে কথা বলা বাদে আর কারও সাথে আপনি কথা বলেন? ডালিম বলে, না তেমন প্রয়োজন হয় না। করিমের বাবা চাষি লোক। সারাদিন মাঠে কাজ করে সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফিরে বাড়ির কিছু কাজকর্ম করে খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়ে। সারাদিন হয়তো দু'একটি চাষির সঙ্গে কথা হয়। তাহলে কি আমরা বলব আপনি অথবা করিমের বাবা অসামাজিক। আবার আপনি বলছেন প্রয়োজন হয় না। তাহলে আপনি স্বীকার করছেন যে মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে মেলামেশা করে। মিহিরের প্রশ্ন শুনে অনুকূল স্বাভাবিক হয়ে বসে, বাহাদুর হাই তোলার মতো করে আর করিম কোনো কথা না বলে মাথা নিচু করে পা নাড়ানোর গতি কমিয়ে দেয়। মিহির আবার বলে, আপনি বলছেন অসামাজিক। তাহলে সামাজিক কী?

স্বপন বলে, মানুষের সুবিধা অসুবিধায় থাকায় সামাজিক।

মিহির বলে, শ্রমমূল্যের বিনিময়ের মধ্যে দিয়েই মানুষ হয় সামাজিক। অর্থাৎ শ্রমমূল্যের সঠিকভাবে বিনিময় করেন যিনি তিনিই সামাজিক। এখানে দুটি শব্দ 'শ্রমমূল্য' এবং 'শ্রমমূল্যের বিনিময়'। শ্রমমূল্য অর্থাৎ কোন এক চাষি জমিতে আলু চাষ করল। ধরো এক কুইন্টাল আলু উৎপাদিত হল। আলুর দাম কীভাবে নির্ধারিত হবে অর্থাৎ শ্রমমূল্য কী হবে? জমি কর্ষণ করা থেকে ফসল ঘরে তোলা পর্যন্ত যাবতীয় খরচ তার সাথে শ্রমিকের পারিশ্রমিক বিনোদন স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং আমিত্ব বিকাশেও মূল্য ওই এক কুইন্টাল আলুর মূল্যেই নিহিত থাকবে। যিনি এই মূল্য সচেতন তিনি হলেন রাজনৈতিক আর যিনি মূল্যের বিনিময় সচেতন তিনি হলেন সামাজিক। তাহলে মূল্যের বিনিময় জানাটা খুব দরকার। ধরুন চাষি ফসল

চাষ করে মূল্য উৎপাদন করে কিন্তু শিক্ষা দান করে না। কিন্তু একজন শিক্ষক শিক্ষা দান করেন এবং শিক্ষার মধ্যে দিয়ে একজন দক্ষ শ্রমিক তৈরি করেন। তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে একজন শ্রমিকের যেমন শিক্ষার প্রয়োজন ঠিক তেমনি একজন শিক্ষকের খাদ্যের প্রয়োজন। এই খাদ্যের সাথে শিক্ষার যে বিনিময় সেটাই হচ্ছে শ্রমমূল্যের বিনিময়। আপনি কি এটা মানেন? স্বপন অনুকুলের মুখের দিকে চেয়ে দেখে বলে হ্যাঁ মানি। আমাদের আশপাশের চারটি গ্রামের মধ্যে আপনাদের তথাকথিত রাজনৈতিক দলের নেতা সাবির এবং জাবির দশটি সম্পদশালী ব্যক্তির মধ্যে দুজন। আপনি কি এটা স্বীকার করেন? উত্তরের অপেক্ষা না করেই মিহির বলতে থাকে, যতটুকু জানা যায় সাবিরের বাবা একজন বিড়ি শ্রমিক ছিলেন আর জাবির তার ছাত্রজীবনে দরিদ্রতার জন্য সাইকেল মেরামতের কাজ করতেন। তারা এখন পর্যন্ত তেমন কোনো বড় ব্যবসা বা বড় চাকরিও করেন না। তাহলে কী করে এত সম্পদের মালিক হলেন ? এই মানুষগুলোকে কি আপনি সামাজিক বলবেন। কারো মুখে কোন কথা নেই সবাই নীরবে বসে থাকে। স্বপন ও করিম উরু চাপড়ানো আর পা নাড়ানো বন্ধ করে দেয়। কিছুক্ষণ পর করিম বলে, এই মিহির বাড়ি যাইরে বাড়িতে রুটিগুলো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, খাওয়া-দাওয়া করে আসছি, বলে উঠে চলে যায়।

# ব্যক্তি আত্মবিকেন্দ্রিকতায় স্রষ্টা,আত্মকেন্দ্রিকতায় বিধ্বংসী

**নিকোলাই**

১।। ব্যক্তি চরিত্রের যতগুলি ট্রেইটস(Traits) তাকে দুটি বৃহৎ শ্রেণিতে ফেলা যায়। ক) সাবজেকটিভ ট্রেইটস অর্থাৎ বিষয়ীমুখী বা ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্য। খ) অবজেকটিভ ট্রেইটস অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্য।

২।। প্রশ্ন হল, এই দুটি দিক ব্যক্তি চরিত্রে অটোমেটিক এসে যায়? না। দুটি অটোমেটিক আসে না। একটি অটোমেটিক আসে। সেটি ব্যক্তিক দিক। কারণ এই দিকটিতে ব্যক্তি চরিত্র তার সত্তার তলদেশ বিজড়িত।

মানে কী? ব্যক্তি সত্তার প্রাথমিক ডমিন্যান্স আত্মকেন্দ্রিক মেরুতেই থাকে! এর জন্য তাকে কোনো শক্তি প্রয়োগ করতে হয় না। পদার্থ বিজ্ঞানে যেমন জলের নিচের দিকে গড়াতে কোনো শক্তি প্রয়োগ করতে হয় না। কিন্তু সেই জলকে উপরে তুলতে শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। জলের নিচের দিকে গড়িয়ে যাওয়া অর্থাৎ আত্মকেন্দ্রিক প্রবণতা ব্যক্তি সত্তায় জন্মসূত্রিক অটোমেটিকভাবে ডমিন্যান্ট।

কিন্তু উল্টোটা অর্থাৎ জলকে উপরে তোলা অর্থাৎ আত্মবিকেন্দ্রিক প্রবণতাকে ডমিন্যান্ট করাতে শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। সে বড় কঠিন কাজ। বড় সাধনার কাজ।

৩।। ব্যক্তিসত্তা আত্মবিকেন্দ্রিক না হলে অর্থাৎ আত্মকেন্দ্রিক হলে কী ঘটে? যার জন্য এত শত সাত কাহন কাহিনি বানাতে হচ্ছে। আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিসত্তা দুটো ঘটনা ঘটায়। প্রথমত, তার নিজের বিকাশে নিজেই বাধা হয়। দ্বিতীয়ত, আর্থসামাজিক বিকাশকেও ব্যাহত করে। কীভাবে?

এই কাণ্ডটা সে মূল্য (অর্থাৎ অর্থনীতির সূত্র) উৎপাদন-বিনিময়-বিন্যাস প্রক্রিয়াটি ঘেঁটে দিয়ে ঘটায়। আত্মকেন্দ্রিকতায় সে আবশ্যিক ও উদবৃত্ত মূল্যের পার্থক্য করতে পারে না। আবশ্যিকের পরেও সে উদবৃত্ত মূল্যের দখলদারি করে। পরিণামে মূল্যের কেন্দ্রীভবন ঘটে। বেকারত্ব-দারিদ্র্য-যৌনবৃত্তি-ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদির সংক্রমণ ঘটে। সমাজটা শ্রেণি বিভক্ত নরকে (নরের অক অর্থাৎ মানুষের জন্য আগুন) রূপ নেয়।

এই আগুনমুখী আর্থসমাজে ব্যক্তি এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের প্রাণি! রামায়ণে যা লঙ্কা-রূপে বর্ণিত!

৪।। এই লঙ্কার বৈশিষ্ট্য কী? জড় চাকচিক্যের মহেঞ্জোদাড়ো! আর? ব্যক্তি সমূহ কালচারশূন্য অর্থাৎ জীবনবোধ শূন্য অর্থাৎ অর্থনীতি-রাজনীতি-সংস্কৃতির বোধশূন্য অর্থাৎ রাজনৈতিক চেতনাশূন্য! এতে কখন যে সমাজটি শ্রেণিবিভাজনের দুই মেরু প্রান্তিকতায় বিভক্ত হয়েছে জানতে পারা যায় না। কিন্তু তার পরিণামী নরক যন্ত্রণার দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

৫।। এই দুর্ভোগের সাম্রাজ্য যাদের সমস্ত জড়ভোগের মূল্য যোগায় তারা তা নিষ্কণ্টক করতে কত কাণ্ডই না করে!

কোনোভাবে মানব চেতনার আত্মবিকেন্দ্রিক বিকাশ হলেই তার সাম্রাজ্য খতম, সে এটা ভালো করেই জানে! তাই এর প্রতিরোধ করতে সে উঠে পড়ে লাগে। ভাবনার জগতটিকে বিকৃত করতে অতীন্দ্রিয়তার

সংক্রমণ করে। নানান ধারণার নানান কাহিনি নির্মাণ করে! যার আশ্রয় প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলি! যার লেজুড়ে তাবিজ-কবজ-মাদুলি-লালসুতো-নীলসুতো-মাজার দরগা কত কী!

অর্থাৎ চেতনাক্ষীণ মানুষকে অতি সহজেই ভাগ্য নামক অন্ধকারে ঢুকিয়ে দিয়ে জীবনটাকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে দেখানো যায়! সব কিছুই ঠিক ছিল খালি ভাগ্য সাথ দিলেই বাজিমাত! এই রকম কত না ধারণার ছক্কা কষে মগজ চিবিয়ে খাওয়া হয় তার ইয়ত্তা নেই! কে খায়?

৬।। একেবারে গোড়ার কথায় আসা যাক। ব্যক্তি ব্যক্তিকেন্দ্রিকতায় ক্রমশ বুঁদ হয়ে গেলে ব্যক্তিচরিত্র তখন অসামাজিক। কারণ কম দামে শ্রম কেনা আর বেশি দামে বেচায় তখন তার একমাত্র কাজ! অর্থাৎ তার বিশেষণে তখন তাকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি রক্ষ বলে। এই রকম ক্ষুদ্র-ছোট-মাঝারি-বড় ইত্যাকার ব্যক্তি-রক্ষ মিলেই আর্থসামাজিক রাক্ষসদের লঙ্কাপুরি! এই লঙ্কাপুরির আপাত চিকন জৌলুস এর নেপথ্যে থাকে মূল্য চুরির গোপন ইতিহাস! আর সেই ইতিহাসকে ঢাকতে নানান কাহিনির জাল বুনে মানব চেতনাকে ঘুম পাড়ানোর ব্যবস্থা তাকে করতে হয়!

৭।। ব্যক্তি-রক্ষ সব কালেই তার ব্যাক আপ আর্থসামাজে পেয়ে যায়। এ যুগে এই ব্যাক আপের নাম কর্পোরেট শক্তি! আর সেই শক্তির লেজুড় হরেক রাজনৈতিক দল। ঘেঁটে যাওয়া আর্থসমাজের রক্ষ-কোল লাগা ব্যক্তিদের পরিণতি তার লেজুড় বৃত্তিকার কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলকেই সে আশ্রয় করে! ব্যাস! ষোলো কলা পূর্ণ হল! আরও আরও অর্থ এবং অথবা ক্ষমতা-প্রতিপত্তি নেশায় সে তখন মত্ত! ব্যক্তি-দল গুলিয়ে গিয়ে আরোও কিম্ভূতকিমাকার হয়ে যায়! ক্ষমতা হারাবে আশঙ্কা হলে দলত্যাগী আয়ারাম-গয়ারাম কাণ্ড এদের কাছে কোনো ব্যাপার না! কাদের কাছে ব্যাপার?...

৮।। এই ব্যক্তি কি---

নাগরিক নয়?... না, সে নাগরিক নয়। কারণ ভাল মন্দের ঔচিত্যবোধ তার শূন্য।

সে কি রাজনৈতিক নয়? না। সে দলভিত্তিক নানান 'রাজনীতিতে' মিশে থাকলেও তার রাজনৈতিক চেতনা শূন্য। কারণ তার মূল্য চেতনা নেই।

সে কি সামাজিক নয়?... না। সে অসামাজিক। কারণ তার মূল্যের বিনিময় সচেতনতা নেই। মানে সে মূল্য কুক্ষি করে! সে অ্যান্টিসোশ্যাল!

অতঃপর ব্যক্তি কী করবে? রক্ষ-চাপানো নানান ধারণার তলায় খাবি খেতে খেতে সে কি উপরে উল্লিখিত রক্ষ বনে যাবে? তারই আওতায় নানান মানস কাঙালিত্বে ভুগতে থাকবে— ছোট-বড়, ধনী-গরিব, সুন্দর-কুৎসিত, চালাক-বোকা এই সব করবে আর এই সব কেন্দ্রিক নানান কাতরানিতে নিজে কাতর হবে আর সমাজটাকেও কাতর করবে?.. না কি সে খুঁজে দেখতে চায় তার আত্মপরিচয়? গঠন করতে চায় তার পাণ্ডবী নৈর্ব্যক্তিকতামুখীন অর্থাৎ আত্মবিকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্ব?...

শেষোক্ত আত্মপরিচিতির সন্ধানেই অদ্যাবধি পৃথিবীতে ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে!

ভাবা যাক। ভাবের পুরাণেই নিহিত পরবর্তী বস্তুর নান্দনিক বাস্তবতা!

---

# সিপিএম:কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট

(২০ পৃষ্ঠার পর, শেষাংশ)

**জ) সংযুক্ত মোর্চা বিকল্প সরকারের ভাবনা**

কেন্দ্রীয় কমিটি বিজেপি টিএমসি বিরোধী ভোট কনসোলিডেট করতে অন্য পার্টির সাথে আসন সমঝোতার কথা বলেছিল। কিন্তু রাজ্য পার্টি কংগ্রেস আই এস এফ এর সাথে জোট করে সংযুক্ত মোর্চা নাম দিয়ে বিকল্প সরকারের কথা বলে বসল। যা ছিল ভুল এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত বিরোধী। যদিও কোনো কমন মিনিমাম এজেন্ডা ছিলনা। কংগ্রেস আইএসএফকে মানে নি। আইএস এফ সেকুলার বক্তব্য ও লোকজন দাঁড় করালেও তার মাইনোরিটি আউটফিট ইমেজ ঝেড়ে ফেলতে পারেনি।।

এর পরে রয়েছে কী করিতে হইবে টাইপের নিদান।

(পার্টির ওয়েব সাইটে প্রকাশিত রিভিউটির সার সংক্ষেপ তরজমা করে দেওয়া হয়েছে। কোনো মন্তব্য করা হয়নি।)

প্রবন্ধ

# জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০

মিনারুল হক

মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক ২০১৫ সালে টি.এস.আর. সুব্রমানিয়ানকে জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়া রচনার ভার দেওয়া হয়। ইসরোর চেয়ারপার্সন কস্তুরী রঙ্গনকে কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়। কমিটি ৪৮৪ পৃষ্ঠার খসড়া ২০১৯-এ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করে। প্রস্তাবিত খসড়াটি নিয়ে পার্লামেন্টে আলোচনা করা হয়নি। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হল না। আম জনতার থেকে মতামত চাওয়া হল। এই খসড়া নীতিটিরই বেশকিছু পরিবর্তন করে ২০২০ এর ২৯ জুলাই নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি রূপে সরকার গ্রহণ করল।

## নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির সুপারিশ সমূহ

১) একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে যে পৃথক আর্টস, সায়েন্স ও কমার্সের স্ট্রিম ছিল, তা বাতিল করে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ অঙ্কের সাথে ইতিহাসও নিতে পারবে।

২) প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষার উপর জোর দিলেও উচ্চশিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৩) ডিজিটাল এডুকেশন ও ভোকেশনাল এডুকেশনে জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

৪) বিশ্বের প্রায় ১০০টি নামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস খোলা হবে।

৫) মূল্যায়ন ব্যবস্থায় পূর্বের কাঠামোকে ভেঙে নতুন কাঠামোর কথা বলেছে। ছাত্ররা নিজে, সহপাঠীদের দ্বারা ও শিক্ষক দ্বারা মূল্যায়ন ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে।

৬) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ব্যবস্থাকেও ভেঙে নতুন করে আরো জটিল স্তরের কথা এসেছে।

## সুপারিশ সমূহের বিশ্লেষণ

নতুন শিক্ষানীতি মূলত আগের শিক্ষানীতিগুলির যে ভিত্তি ছিল তাকে ধ্বংস করেছে। আগের নীতিকে কাটছাঁট করে এদিক ওদিক জুড়ে একে জগাখিচুড়ি করা হয়েছে। এক এক করে দেখা যাকঃ-

### ১। অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নীতি পাশ

জাতীয় শিক্ষানীতি পাশ হল পার্লামেন্টের বাইরে। বিরোধী দলগুলির সামনে আনা হলো না। যা গণতন্ত্র বিরোধী। বিরোধী দলের অন্যতম সাংসদ শশী থারুর প্রশ্নটি পার্লামেন্টে উত্থাপনও করেছেন। কিন্তু তাদের কাজ ঐ পর্যন্তই। তারা নীতিগুলির দুর্বলতার দিকগুলি সমাজকে দেখাতে পারেননি।

### ২। অথরিটারিয়ান মানসিকতার প্রকাশ

নতুন শিক্ষানীতির মতো একটা বৃহত্তর কাজের জন্য ISRO চেয়ারপার্সনকে কমিটির চেয়ারম্যান করা কর্তৃত্ববাদীতার নামান্তর। কমিটির মাথায় বসিয়ে যা খুশি ইচ্ছেমতো করে নিয়েছেন। দেশে শিক্ষাবিদদের কি আকাল পড়ে গেলো মোদি জমানায়?

বড়ো বড়ো বুলি ছাড়া শিক্ষানীতির মধ্যে তেমন কিছুই নেই। কিছু শব্দবন্ধ দিয়ে শিক্ষা নীতির নির্দেশনা ও প্রয়োগ হয় না। আগের কমিশনগুলির দিকে একটু নজর দিলে আমরা দেখতে পাই যথেষ্ট গবেষণা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণী আলোচনার মাধ্যমেই নীতিগুলি তাঁরা নির্দেশ করেছেন। প্রয়োগের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম তাঁরা অনুসরণ করেছিলেন।

### ৩। প্রাথমিকে মাতৃভাষায় জোর, উচ্চশিক্ষায় অবহেলা

প্রাথমিক ক্ষেত্রে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার কথা বলা হলেও উচ্চশিক্ষায় মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদানে তেমন কিছু বলা হয়নি। ইংরেজির সাথে সাথে সেখানে প্রচ্ছন্নভাবে হিন্দি ভাষাকে চাপানোর গোপন ইচ্ছা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের কোনো বিষয়ে পারদর্শী করে তুলতে গেলে শিক্ষার মাধ্যম অতি অবশ্যই মাতৃভাষায় হতে হবে। মাতৃভাষাকে মাতৃদুগ্ধের সম বলে অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন। আগের শিক্ষা কমিশনগুলি সেকথা স্বীকার করেছেন। সেই মতো সুপারিশও করেছিলেন তারা। নতুন শিক্ষানীতির এই সুপারিশ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলার জন্য যথেষ্ট। শিক্ষাক্ষেত্রে একটা বিভেদমূলক ব্যবস্থা গড়ে উঠতে যাচ্ছে।

### ৪। শিক্ষার বাণিজ্যিকিকরণ

বিশ্বের ১০০টি ইউনিভার্সিটিকে দেশে ক্যাম্পাস খোলানো হবে। শিক্ষা নিতে পারবে ভারতীয়রা। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা নিতে অবশ্যই দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় বেশি অর্থ লাগবে।

সবার পক্ষে শিক্ষা নেওয়া সম্ভব হবে না। তবে কারা শিক্ষা নেবে? যাদের হাতে প্রচুর অর্থ রয়েছে। তাদের সাথে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের অসমতা তৈরি হবে। শিক্ষাকে প্রাইভেট হাতে তুলে দিয়ে দেশের মধ্যে বিভাজন করা যাবে। দেশের টাকা দিয়ে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় এনে দেশের একটা এলিট শ্রেণির শিক্ষা দেওয়াকে কি ইউনিভার্সাল এডুকেশন বলা চলে? দেশের শিক্ষার গুণমান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িয়ে সকলকে শিক্ষাঙ্গনে এনে বিশ্বের অন্যান্য দেশের শিক্ষার্থীদের সমপর্যায়ের মানে উন্নীত করাকেই Universalization of Education বলে।

## ৫। মাল্টি ডিসিপ্লিনারি বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি

নতুন শিক্ষানীতির সবচেয়ে ক্ষতিকর, হাস্যকর, অবান্তর, অবৈজ্ঞানিক নীতি হল মাল্টি ডিসিপ্লিনারি বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটানো। মাল্টি সাবজেক্টসের বিষয়টি কেমন? কোনো একজন ছাত্র বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করতে চায়। সে বিজ্ঞানের সাথে স্বাভাবিকভাবে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়গুলি নিয়ে পড়বে। নতুন নীতি বলে, সে তার সাথে ইতিহাস নিতে পারবে। কিংবা বাংলার সাথে অঙ্ক নিতে পারবে। কী হল ব্যাপারটা? বাংলায় কিংবা বিজ্ঞান অথবা অঙ্ক যে বিষয়ই হোক না কেন সেই বিষয়ে শিক্ষার্থীর ব্যুৎপত্তির দরকার থাকলো না। যা খুশি একটা নিলেই হল। অর্থাৎ গভীরতায় না গিয়ে উপর উপর কিছু তথ্য ও কৌশলে দক্ষ হলেই হবে। বিষয়ে মাষ্টারি অর্থাৎ পাণ্ডিত্য অথবা স্নাতক তথা সম্পূর্ণরূপে অবগাহনের প্রয়োজন নেই। কেননা সরকার এই ধরনেরই নাগরিক চায়, যারা নামে হবে শিক্ষিত, ডিগ্রিতে শিক্ষিত হবে বটে, হাতে-কলমে জীবনে হবে বালখিল্য, না থাকবে জ্ঞানের শক্তি, না থাকবে সাহস। সেই শিক্ষা নেওয়া শিক্ষিতদের মুখে কি অধিকারের ভাষা আশা করা যায়? না তারা তাদের অধিকারের জন্য কোনো ধরনের আন্দোলনে সামিল হতে পারে?

## ৫। শিক্ষাব্যবস্থাকে বিশৃঙ্খল ও খেলোকরণ

শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশ ও প্রস্থানের যে নীতি অর্থাৎ কিনা মাল্টিপল এন্ট্রি অ্যান্ড এক্সিট সিস্টেমের কথা শুনে মনে হবে, বাহ! কী ভালো যখন তখন শিক্ষা নেওয়া যাবে, আবার বেরিয়েও আসা যাবে। খুবই সহজলভ্য শিক্ষা? জটিলতা নেই, কত সরল? শিক্ষার কাজ হল জীবনকে নিয়মে পরিচালনা করা। কিন্তু যে শিক্ষা ব্যবস্থায় অনিয়ম শেখানো হয়, শিক্ষা জীবনে কি নিয়ে আসবে, প্রশ্ন ওঠে? 'Exit point first and second year, leading a certificate and diploma respectively are yet another attempt to throw away students with a false notion of achievement'- Said Nandita Narain, DU-TA President.

## ৬। শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ এর লঘুকরণ

শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ এ বলবৎ করা হয়েছিল। তা সংবিধানের ২১-ক ধারায় উল্লেখ করা হয়েছিল। ৬-১৪ বছর বয়সের শিশুর মৌলিক শিক্ষা সুনিশ্চিতকরণের জন্য। বর্তমান নীতিতে তা ৬-১৮ বছর করা হয়েছে। কিন্তু ২০১৬-১৭ বর্ষে দেখা যাচ্ছে রাইট টু এডুকেশন এ্যাক্ট এর বিধিগুলি মাত্র ১৩ শতাংশ স্কুল ফলো করেছে। বাকিরা ব্যর্থ। তাহলে এই আইনে শিক্ষার সময় তথা বছর বাড়ানোতে কি ফলাফলের কোনো ব্যত্যয় হবে? বরং স্কুল সেই নীতিগুলি যাতে ফলো করে সেজন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সংস্থা আছে। তারা কোনো ফাংশন করছেনা কেন, তার পর্যালোচনা করা দরকার।

## ৭। পরিকাঠামোর পরিবর্তন ছাড়াই ডিজিট্যাল ও টেকনিক্যাল এডুকেশন এর প্রস্তাব

নতুন শিক্ষানীতিতে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকেই টেকনিক্যাল, ভোকেশনাল কোর্সের কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি ডিজিট্যাল মাধ্যমে পড়াশোনার উপর জোর দেওয়া হবে বলা হয়েছে। অঙ্গনওয়াড়ি থেকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্কুল ও হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলগুলির বর্তমান পরিকাঠামোতে টেকনিক্যাল-ভোকেশনাল শিক্ষা, ডিজিট্যাল মাধ্যমে দেওয়া কি সম্ভব? বৃহৎ সংখ্যক শিক্ষার্থীর ডিজিট্যাল প্রযুক্তি ব্যবহারের সামগ্রী নেই। দেশের অনেকাংশে এখনো বিদ্যুৎ নেই। সবার কাছে স্মার্ট ফোন নেই। সর্বশিক্ষা মিশনের মাধ্যমে প্রাথমিক স্কুলগুলির পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটলেও তা পর্যাপ্ত নয়। শুধুমাত্র ঘোষণা দিয়ে বা নীতি বানিয়ে পরিকাঠামো হয় না। তার জন্য দরকার রিসোর্সের। যার কোনো দিশা নীতিতে বলা নেই। ট্র্যাডিশনালি বাজেটের একটা শতাংশ বৃদ্ধির কথাই আছে।

## ৮। জিডিপির ৬ শতাংশ ব্যয় প্রস্তাব

নতুন শিক্ষানীতি আগের কমিশনের মতো শিক্ষাখাতে বাজেটের ৬ শতাংশ ব্যয়ের কথা বলেছে। বিগত সরকারের সময়ে ২ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হতো, এই সরকারের আমলে তা আরো নিচে নেমে

গেছে। শিক্ষায় দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন আমরা আগেই দেখেছি। আগের থেকেই যেখানে ব্যয় বরাদ্দ কমেছে, সেখানে আবার বাড়ার আশা কী করে করা সম্ভব। দেশের যে আর্থিক অবস্থা এবং তার সাথে সরকার যেভাবে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে বেসরকারিকরণ করছে, তাতে ঘোষিত ব্যয় বরাদ্দ কাগজেই লেখা থাকবে। বাস্তবে প্রযুক্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

## ৯। মূল্যায়ন ব্যবস্থায় মানদণ্ডহীন পদ্ধতি

মূল্যায়ন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে তৃতীয়, পঞ্চম, অষ্টম শ্রেণির পরীক্ষা হবে। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি সেমিস্টার ওয়াইজ পরীক্ষা থাকবে। মূল্যায়নে তিন ধরনের পদ্ধতির কথা এসেছে—শিক্ষার্থী নিজে, সহপাঠী কর্তৃক এবং শিক্ষক দ্বারা। মূল্যায়নের মাপকাঠি তথা মানদণ্ড নেই। শিক্ষার্থী ও তার সহপাঠীরা কীসের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করবে তার সংগঠিত রূপরেখা নেই। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় পরীক্ষা সংস্থার কথা বলেছেন, তার সাথে রাজ্য সংস্থার কোনো সম্পর্ক স্থাপন করা হয়নি। রাজ্য সংস্থাগুলির পূর্বেকার ক্ষমতা হ্রাস করা হয়েছে।

## ১০। অসংগঠিত গবেষণার প্রস্তাব

চার বছরের ইন্টিগ্রেটেড শিক্ষার সাথে গবেষণার কথা বলা হয়েছে। তাকে গবেষণা বলা যায় কিনা ভেবে দেখা দরকার। একথাও বলা হয়েছে কোর্সের পরে পিএইচডি কোর্স থাকবে। তাহলে কী হল, আগে একটা গবেষণার নামে পত্র প্রদান এবং তারপর আবারও পিএইচডি আলাদা করে—এই দুই এর মানগত পার্থক্য হয়ে যাবে না? অর্থাৎ সবকিছুকে সস্তা করা। যার পরিকাঠামোও নেই কলেজগুলিতে। গবেষণার সার্টিফিকেটও দেওয়া হবে, কিন্তু পরিকাঠামোর উন্নয়নে কোনো প্ল্যান অফ এ্যাকশন নেই।

নতুন শিক্ষানীতির বিশ্লেষণে দেখলাম বর্তমান সরকার শিক্ষানীতিতে কর্তৃত্ববাদী, কিছু নতুন শব্দবন্ধ, আগের কিছু ভেঙে-কিছু জুড়ে-কিছু বাদ দিয়ে নতুন শিক্ষানীতি নাম নিয়ে এসেছে। পাশাপাশি শিক্ষার বাণিজ্যিকিকরণ শিক্ষাকে হালকা ও অগভীর করেছে, স্বাধীন সংস্থাগুলি বাদ দিয়ে নতুন কিছু সংস্থা যার নিয়ন্ত্রণ কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই থাকবে অথচ শিক্ষা যৌথ তালিকাভুক্ত তা কোথাও প্রতিফলিত হয়নি। সমাজের বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণিভিত্তি থাকা অবস্থায় তাকে অস্বীকার করেছে। যেমন- বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষার্থী, আর্থিক ও সামাজিকভাবে পশ্চাৎপদ শ্রেণির কথা আমতা আমতা করে বলে ছেড়ে দিয়েছে।

এর আগের কমিশনগুলি শিক্ষানীতির প্রয়োগের জন্য বিশেষত ১৯৮৬ সালে একাধিক টাস্ক ফোর্স গঠন করেছিল। শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে কর্মপরিকল্পনার ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। তারা প্রারম্ভিক শিশু কল্যাণ ও শিক্ষা, ভোকেশনাল এডুকেশন, ওপেন ইউনিভার্সিটি, গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চশিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, নারী ও বিকলাঙ্গদের সামাজিক সমতার শিক্ষা, মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করে শিক্ষানীতি প্রয়োগের দিক নির্দেশনা প্রদান করেছিল।

## বস্তুবাদী আর্থসমাজের শিক্ষানীতির মডেল

বস্তুবাদী আর্থসমাজের অন্যতম ভিত্তি হবে দেশের অর্থনীতির বিকাশ। সেই বিকাশ আবার নির্ভরশীল সংস্কৃতির উপর। অর্থাৎ কিনা সাংস্কৃতিক কর্ষণেই নিহিত দেশের আর্থ-রাজনৈতিক মান। সংস্কৃতির বীজ নিহিত আমিত্বকর্ষণ ও অর্থনীতির জীবনগামী প্রায়োগিকতায়।

আমিত্বকর্ষণ ও অর্থনীতির ব্যবস্থাপনার জন্য শিক্ষা থেকে শুরু হবে ব্যক্তি ও আর্থসমাজের অগ্রসরতা। তার পরিণতি ঘটবে দীক্ষার প্রায়োগিক ব্যবস্থাপনাতে। তার জন্য কি ফর্মাল এডুকেশনের ব্যবস্থা থাকবে না? অবশ্যই থাকবে। কিন্তু বর্তমান রাক্ষিক সমাজের রক্ষণকামী শিক্ষা ব্যবস্থার মতো নয়। বস্তুবাদী আর্থসমাজের শিক্ষা হবে জীবনবাহী। ব্যক্তি ও আর্থসমাজের যে সকল সমস্যার সাধারণভাবে মোকাবিলা করতে হয় তার শিক্ষা এবং বিশেষ বিশেষ সঙ্কটকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার শিক্ষা। তার সাথে সমকালীন আর্থসমাজের আর্থ-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান্তর ঘটানোর জন্য গবেষণা ও কারিগরি শিক্ষা। শিক্ষা ব্যক্তি তথা সমাজ জীবনকে সুন্দর, সুস্থ, গতিশীল করার জন্য পরিচালিত হবে। কী শিখছি, কেন শিখছি, শিখে কী হবে, শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ কেমন করে ঘটানো যাবে, কোথায় ঘটাবো, কী প্রাপ্তি ঘটবে—এই সকল প্রশ্নমালাকে সামনে রেখেই শিক্ষার বিষয়, সিলেবাস-কারিকুলাম নির্ধারিত হবে।

কর্পোরেট মুখাপেক্ষী শিক্ষানীতিতে শিক্ষার বাণিজ্যিকিকরণ যেকোনো বিভেদকরণ বস্তুবাদী আর্থসমাজে ছেঁটে ফেলা হবে। শিক্ষানীতি হবে গতিশীল— ব্যক্তি ও আর্থসমাজ গঠনের অন্যতম হাতিয়ার।

# মানুষের ধর্ম
শ্রীচেতনিক

## ন্যায় কী আর অ-ন্যায়ই বা কী?

ন্যায় হল মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। অ-ন্যায় তার উল্টো অর্থাৎ অধিকার হরণ করা।

অধিকারের প্রশ্নটি শ্রমমূল্য হিসেবে আর্থসমাজে আসে। আর্থসামাজিকভাবে প্রযুক্ত শ্রম যে মূল্য সৃষ্টি করে তার দখলদারি নিয়েই যত লড়াই, ঝগড়া, দ্বন্দ্ব-বিরোধ, বিবাদ-বিসম্বাদ!

মার্কস এর আগে ফরাসী পণ্ডিত প্রুধোঁ বলেছিলেন Property is Theft! অর্থাৎ ব্যক্তি মালিকানায় থাকা ধন মানে চৌর্য! ভাষান্তরে, চুরি ছাড়া ব্যক্তিমালিকানাধীন ধন জমতেই পারেনা।

ব্যক্তি মালিকি এই ধন জমা মানেই আসলে কারুর অধিকার হরণ। অধিকার হরণের আইনগত ভিত্তি হল ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তির রক্ষা আইন। শুধু আইন নয় তাকে নৈতিক ভিত্তি দিতে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে মাঠে নামতে হয়।

সম্পত্তি সম্পর্কের চৌহদ্দির আওতায় অপরাপর আর্থসামাজিক সম্পর্কগুলি নির্ণীত হয়। এই সম্পত্তি সম্পর্কটিকেই যুগে যুগে পবিত্রতার(!) শংসাপত্র দেয় ধর্ম-ধারণার প্রাতিষ্ঠানিকতা।

অতঃপর সব যুগে সব কালে সকল সমাজেই প্রাতিষ্ঠানিক অর্থাৎ রক্ষণকামী ক্ষমতা সার্টিফায়েড ধর্ম-ধারণা সেই সম্পত্তি-সম্পর্ক ও তার অপরাপর আর্থসামাজিক উপসর্গগুলিকে বৈধতাদানের পবিত্র (!) কর্তব্য পালন করে থাকে। তাই সেই অ-ন্যায় সম্পত্তি-সম্পর্কটিকে অর্থাৎ আর্থসামাজিক শ্রমসম্পর্কটিকে ভেঙে দিয়ে মানুষের অধিকার ভিত্তিক শ্রম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে প্রথমেই সেই অ-ন্যায় ক্ষমতাকে নৈতিক শংসাপ্রদানকারী ধর্ম-ধারণার রক্ষণকামী ঢালটিকে নস্যাৎ করার দরকার হয়।

## বিগত অধ্যায়ের দৃষ্টান্ত

ক)

রাসুলুল্লাহ মধ্যপ্রাচ্যে আর্থসামাজিক শান্তি তথা মানবতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কীসের দ্বারা সবচেয়ে বেশি বাধা প্রাপ্ত হয়েছিলেন? তাঁর পিতৃপুরুষ পুজিত 'ধর্ম' ধারণার দ্বারা। গোটা কোরায়েশ বংশ সেই ধারণার ভারবাহী। তারা সর্বশক্তি দিয়ে তাঁকে পরাজিত করার চেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু বিফল হয়েছিল। উল্টে মক্কা বিজয় পরবর্তীতে সেই ধারণাকে ঝাড়ে-বংশে নিপাত করা হয়েছিল। এমনভাবেই নিপাত করা হয়েছিল যাতে সেই ধারণার কোনো পুরাণ অবশিষ্ট না থাকে। কেন?

খ)

গৌতম বুদ্ধ দুঃখ, দুঃখের কারণ ও তার নিবারণের তত্ত্ব সূত্রায়নে মানবতা বিরোধী অপশক্তি হিসেবে কাকে চিহ্নিত করলেন?

ব্রাহ্মণ্য বর্ণবাদী 'ধর্ম' ধারণা ও তার শাস্ত্রগত ভিত্তিরূপী 'বেদ'কে। খণ্ডন করলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-ধারণা। সূত্র দিলেন অষ্ট-অনাঙ্গিক মার্গ অর্থাৎ জীবনগামী পন্থার। সূত্র দিলেই তো হত, ব্রাহ্মণ্য বর্ণবাদকে শত্রু বললেন কেন?

গ)

মুসা প্রতিবাদী জীবন ব্যবস্থা গড়ে ফ্যারাও দ্বিতীয় রামেসিসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে গিয়ে সমকালীন ধর্ম-ধারণাকে নস্যাৎ কেন করলেন? মিশরে দাসত্ব-কাঠগড়া থেকে মুক্তিবাচক অভিপ্সায় প্রতিবাদীদের নিয়ে মিশর ত্যাগ করেছিলেন, সমকালীন জড়বাদী ধর্ম -ধারণা চাপানো দাসত্বকে মেনে নেননি। কেন?

ঘ)

ইশা কেন রোমান অভিজাতদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মানবতা প্রতিষ্ঠায় পূর্বতন ইহুদি ধর্ম-ধারণার অবশেষকে জীবন থেকে ছেঁটে ফেলে মুসাকে প্রতিপাদন করতে গেলেন? তাঁর তো ছিল প্রেমাস্ত্র!

ঙ)

শ্রীচৈতন্য কেন, কীভাবে তাঁর প্রেমসূচক জীবন লক্ষ্যের যুক্তিতর্কগত অবতারণায় সমকালীন ব্রাহ্মণ্য বর্ণবাদকে ঘাঁটাতে গেলেন? কী দরকার ছিল? তার পরিণামে রহস্য-মৃত্যু পাওনা হল আর্থসমাজের। রক্ষণকাম ঘোষণা করেছিল 'লীন হয়ে যাওয়ার' মিথ! কেন?

চ)

সোভিয়েত প্রতিষ্ঠায় মহা বিপ্লবী ভ্লাদিমির উলিয়ানভ লেনিন কেন যৌনবৃত্তি আর যাজক-বৃত্তি রূপ তথাকথিত ধর্ম পালন বৃত্তিকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছিলেন।। কেন?

ছ)

চিনে মাও সে তুং অনুরূপ সেই তথাকথিত ধর্ম ধারণার গোড়ায় কুঠারাঘাত করে ছিলেন! কেন?

জ)

আলবানিয়ার নয়া রূপকার আনোয়ার হোজা

বিপ্লবোত্তর সেখানের মসজিদগুলিকে লাইব্রেরিতে রিফর্ম করেছিলেন। কেন?

ঋ)

ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রাম ও বিজয় উত্তর সমকালীন ধর্ম-ধারণাকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছিলেন হোচিমিন ও তাঁর সাথিরা। কেন?

এ)

মানব জাতির জানা অতীতের চৌহদ্দির আওতায় ইতিহাস সৃষ্টির এমন নজির নেই যেখানে পূর্বের ধর্ম-ধারণা নিশ্চিহ্ন করা হয় নি। কেন?

১।।

## ধর্ম ও দর্শন

ধর্ম ও দর্শন বিষয় দুটি ক্লিয়ার করা দরকার।

প্রথমেই দর্শন। দর্শন অর্থে জীবন ও জগৎকে কেবল ব্যাখ্যা করার ভিশন নয়, সেই দৃষ্টি সূত্রের আর্থসামাজিক প্রায়োগিকতায় আর্থসামাজিক শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতিষ্টা করা।

জীবনের জটিল কুটিল অন্ধকার জড়িমা থেকে জীবনকে বের করে গঙ্গার মত সরল প্রাণপ্রবাহ প্রতিষ্ঠা করাই দর্শনের কাজ।

কিন্তু দর্শনের বস্তুগত সূত্রগুলি আর্থসমাজে প্রয়োগ না করলে রক্ষণকামী ক্ষমতা চক্র সেগুলিকে ক্রমেই নানান কুহকী মিথে ঢেকে দেয়। ক্রমেই তার সাথে অতীন্দ্রিয় ব্যাপার সমূহ আমদানি করে 'ধর্ম-ধারণায়' পর্যবসিত করে দেয়।

এই ধারণা কেন্দ্রিক রীতি-প্রথা-আচার-সংস্কার চালু করে দেয়। ব্যাপারটা অত:পর জমাট বাধিয়ে দেওয়া হয় ! ধর্ম রূপে পরিচিতি পাওয়া এই রীতি-প্রথা-আচার -সংস্কার সর্বস্ব ধারণার জঙ্গল রক্ষণকামী ক্ষমতা চক্রের সর্ব বৃহৎ, সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য, তার ক্ষমতা সাম্রাজ্য বহাল রাখার বাহ্যিক (External) ও প্রতীকী (Symbolic) হাতিয়ার হিসেবে যুগ যুগ ধরে কাজ করে যায়।

অথচ বস্তুগত সূত্রে ধর্ম কী? ধর্ম হল ইউনিভার্সাল ল। মহাবিশ্বের যে নিয়মটিতে গোটা মহাবিশ্ব প্রকৃতি নিয়মানুগ। সেই নিয়মে মানুষ ও তার আর্থসমাজকে নিয়মানুগ করা। তা কখনো দর্শন-সূত্রকে বিকৃতকারী অতীন্দ্রিয় রক্ষণকামী ক্ষমতা-সহচর রীতি-প্রথা-আচার-সংস্কার এর ভারবাহী 'ধর্ম-ধারণার' জঙ্গল নয়।

সেই নিয়মের তত্ত্ব প্রদানকারী ব্যক্তিরা যুগে যুগে তত্ত্ব দিয়েছেন। যুগপন্থার অনুক্রমে সেই তত্ত্বের নিশ্চয়ই কিছু প্রতীকী দিক থেকেছে। জীবনের সংস্কৃতিচর্চা বেগবান অর্থাৎ সজীব থাকলে সেই প্রতীক তত্ত্বের উপলব্ধিতে জীবনের রাস্তা সহজ সরল-ই হতো। কিন্তু কাল পরিক্রমায় এটাই পরিদৃষ্ট হয় যে, সেই সংস্কৃতিচর্চা শূন্যতায় তত্ত্ব রিলেটেড সিম্বলিক উপস্থাপনা রক্ষণকামের বরাবরের হাতিয়ার। তা সে ভারতীয় দর্শন হোক, আল কোরানিক দর্শন হোক বা অন্য যেকোনো বস্তুসূত্রই হোক না কেন। রক্ষণকাম তাকে অতীন্দ্রিয়তা সংশ্লিষ্ট ধর্ম-ধারণাতে পর্যবসিত করে।

২।।

## উল্লিখিত দৃষ্টান্তের বিশ্লেষণঃ

আগের ধর্ম-দর্শন আলোচনাতেই পরিষ্কার যে দর্শনের বস্তুগত সূত্রগুলি আর্থসামাজিক ভাবে প্রযুক্ত না হলেই সেইগুলিকে মিথ বানিয়ে হরেক কাহিনির অবতারণায় ধর্ম-ধারণা খাড়া করা হয়। তখন আর্থসামাজিক ক্ষমতা কর্তৃত্বের চরিত্র রক্ষণকামী।

এটি সব কালেই ঘটে। আবার একবার সেই ধরণা নস্যাৎ করে যে ইজম আর্থসামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করে, তার যুগোপযোগী সংস্করণ না হলে রক্ষ তাকেও গিলে নিয়ে ধর্ম বানিয়ে দেয়। যেমন, ইসলামিজমকে বা বৌদ্ধ দর্শনকে 'ধর্ম' বানানো।

ক)

হজরত মুহাম্মদ (সঃ) এর সমকালীন ধর্ম-ধারণা রক্ষণকামী দাস-মালিকি শ্রম-সম্পর্কের বৈধতা দানকারী Psycho-Symbolic Conservation। শান্তি প্রতিষ্টা করার জন্য আলকোরানিক দর্শন-প্রজ্ঞায় সেই শ্রমসম্পর্কটিকে ভাঙতে প্রথমেই দরকার ছিল সেই ধর্ম-ধারণাটিকে নিশ্চিহ্ন করা। অর্থাৎ সমকালীন আর্থসামাজিক বাস্তবতার মূল প্রতিপাদ্য অর্থাৎ শ্রম-সম্পর্ক এবং তার অনুষঙ্গগত অপরাপর বৈষয়িক ও ভাবাদর্শীয় সম্পর্কগুলি যে স্থিতাবস্থা (Status Quo) বা আর্থসামাজিক অচলায়তন তৈরি করে তার সম্পূর্ণ ধারক ও বাহক হল সমকালীন ধর্ম-ধারণার প্রতিষ্ঠান। অর্থাৎ থিসিস অস্বীকারী প্রথম 'না' এই প্রতিষ্ঠান। তাকে নেগেট না করলে আর্থসামাজিক সিনথিসিস বাস্তবায়িত করা যায় না।

খ)

আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে আর্য জীবন জিজ্ঞাসার নির্যাস রূপে যে সূত্রায়ন আর্য ঋষি করেছিলেন তার আর্থসামাজিক প্রয়োগ না হওয়ায় রক্ষণকামিতা তাকে নিয়ে কী কিম্ভূতকিমাকার কাণ্ড ঘটায় তার প্রমাণ উপমহাদেশীয় জীবন ধারায় হাজার

হাজার প্রথা-আচার-রীতি-সংস্কার মূলক ধর্ম-ধারণার বন্যা। এর উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল ব্রাহ্মণ্য বর্ণবাদ। যে বর্ণবাদ সামন্ত-শ্রমসম্পর্ক ও পরবর্তিতে পুঁজি-শ্রম সম্পর্কের মৌল বৈষয়িক ভিত্তি সহ অপরাপর সমস্ত কিছুর বৈধতা প্রদানকারী অচলায়তনী ধারণা-তন্ত্র। ব্রাহ্মণ্য এই ধারণা-তন্ত্রকে নেগেট করেই তাই গৌতম বুদ্ধকে পাল্টা আর্থসামাজিক দর্শন-সূত্র প্রণয়ন করতে হয়েছিল।

গ)

ফ্যারাও দ্বিতীয় রামেসিস এর সময়কালে হজরত মুসা অর্থাৎ মোজেসের জন্ম। ওই সময় কালেই এক্সোডাসের ঘটনা। আলকোরানের বর্ণনা ও প্রাচীন বিবরণী থেকে জানা যায় এই সময় র‍্যাশনাল বোধের উপর গায়ের জোর প্রাধান্য করতো। ভূমিদাস রূপী কৃষক ও পশুপালন নির্ভর অর্থনীতির যুগ সেটা। রাজা, তার বাহিনী আর প্রজা এইসব পক্ষগুলি বর্তমান। দ্বিতীয় রামেসিস অত্যাচারী ছিলেন। সমকালীন ধর্ম-ধারণার সিম্বল ও তার পুরাণগুলি নিশ্চয় রাজ-ক্ষমতার অত্যাচারের বৈধতা প্রদানকারী ছিল। ইউহুদ বা প্রতিবাদ এবং সেখান থেকে ইহুদি অর্থাৎ প্রতিবাদী মানুষেরা হজরত মুসার নেতৃত্বে মহানিষ্ক্রমণ (Exodus) করেন।

ঘ)

মুসা পরবর্তী সময়কালে ও গ্রীসের ক্লাসিক দার্শনিক যুগের অবসানে রোমান ক্ষমতা বহাল তবিয়ত হলে রোমান অভিজাততন্ত্র কৃষককে ভূমিদাসে পরিণত করে। ইতিমধ্যে মোজেস সূত্রায়িত তৌরাতের কম্যান্ডমেন্টস বর্ণিত নীতিতে আর্থসমাজে ভয়ানক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। অত্যাচারের সম্মুখে তাই প্রেমের অস্ত্র নিয়ে হাজির হলেন ঈশা অর্থাৎ জেসাস। কৃষকরা ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করল। অভিজাতরা প্রমাদ গুণলো। মুসাকে প্রতিপাদন করতে সমকালীন অত্যাচারের সিম্বলিক ভ্যালিডিটি প্রদানকারী ধর্ম-ধারণা অর্থাৎ ইহুদি-প্রাতিষ্ঠানিকতা অস্বীকার করা হল। তার পরের ইতিহাসের উপর বহু কুহেলিকা চাপানো হয়েছে।

ঙ)

ব্রাহ্মণ্য বর্ণবাদী জীবন জাতি ব্যবস্থায় রক্তশূন্য হয়ে গেলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাদের বিদেশি শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা-শক্তি থাকে না। আবার অন্য ধারণার লোকেরা জনতাকে কনভার্ট করতে শুরু করলে তাও প্রতিহত করতে পারে না। এইসব ব্যাপার সহ সেই অচলায়িত আর্থসামাজিক বাস্তবতার গ্লানির মধ্যে সেইখানেই হাজির হয়ে গেলেন শ্রীচৈতন্য তাঁর প্রেমসূচক জীবন লক্ষ্যের যুক্তিতর্কগত অবতারণায়। গণ-জন সক্রিয়তার জোয়ার আসতে লাগলো। ব্রাহ্মণ্য বর্ণবাদ ঘা খেতে লাগলো! প্রমাদ গুনলো। কী হয়, কী হয়! পরের ইতিহাস চক্রান্ত আর চক্রান্ত! বর্ণবাদী খেলায় হারিয়ে গেলেন। তাঁর নাম-কীর্তনী গণজাগরণী কর্মসূচিকে বাঞ্চাল করে খোল করতাল ধরিয়ে আর্থসামাজিক ইশ্যুহীন রীতি-আচার সংক্রমণ করে দিল ব্রাহ্মণ্য বর্ণবাদ!

চ)

প্রাচীন ও মধ্যযুগ পেরিয়ে কালগত আধুনিক যুগ পর্বে এস দেখি একই চিত্র। সে জারের রাশিয়া হোক, জাপানী সাম্রাজ্যবাদী খপ্পরে থাকা চিন হোক, ব্রিটিশ বানিয়ার কবল গ্রস্ত উপমহাদেশ হোক তা আলবানিয়া বা ভিয়েতনাম সব খানেই রক্ষণকামী ক্ষমতা-অধিকৃত শ্রম সম্পর্কের ঢাল হল সমকালীন ধর্ম-ধারণার প্রতিষ্ঠান। কিম্বা এই তো বিংশের সত্তর-আশির দশকীয় পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসক জিয়াউল হক এর আমল। সব খানেই তন্ত্র-রূপী ধর্ম-ধারণা ক্ষমতার দোসর। দোসরের থেকে বড় কিছু।

৩।।

## কথার শেষে

প্রখ্যাত সাম্যবাদী উর্দু কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ যেমনটা তাঁর 'হাম দেখেঙ্গে' কবিতায় দেখিয়েছেন অর্থাৎ সমকালীন রক্ষণকামী ক্ষমতার প্রতিমূর্তী প্রতীক 'ধর্ম'কে মহা চেতনার আসন থেকে টেনে নামানো হবে! সেইখানে অত্যাচারিত লাঞ্ছিত মানুষ ক্ষমতার পরিচালক কর্তৃত্বে আসবেন! বিপ্লবী ক্ষমতা-পরিচালক যৌথ-নের্তৃত্বই সেই মহাচেতনার সমকাল যুগজীবনায়নী এমবডিমেন্ট!

সেইজন্য ইতিহাস নির্মাণী ব্যক্তিত্বরা ইতিহাস নির্মাণ কল্পে ক্ষমতা-সম্পৃক্ত ধর্ম-ধারণাকে নিশ্চিহ্ন করেই আর্থসামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। যুগ প্রজ্ঞার অভাবে পরবর্তীরা সেই শান্তি প্রতিষ্ঠার সূত্রগুলির যুগোপযোগী সংস্করণ না করলে রক্ষণকামিতা সেগুলিকেও বিকৃত-খণ্ডিত-খর্বিত করে ধর্ম-ধারণায় রূপ দেয়। যখন পরবর্তী যুগ প্রযোক্তা ছাড়া সেই ধারণাগুলি আর্থসমাজে পূর্বতন ধর্ম-ধারণার মতই রক্ষণকামী ক্ষমতা-চক্রের সেবাদাসের ভূমিকা পালন করতে থাকে। আবারও সেই মার্কসীয় প্রজ্ঞার থিসিস-এন্টি থিসিস-সিনথিসিস এর পুনর্সক্রিয়তায় প্রথমে

আর্যসমাজ সংস্কৃতির হাইপোথিসিস নির্মাণ করতে হয়। পরবর্তীতে তার আর্থসামাজিক প্রায়োগিকতায় নতুন জীবন প্রবাহের সূচনা ঘটাতে হয়।

**অতঃপর**

১/ হজরত মুহাম্মদ(সঃ) পূর্ববর্তী মূর্খতা-বিশেষিত ধর্ম-ধারণা ধর্ম ছিল না। তিনিই ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

২/ আর্য সূত্রায়ন ব্রাহ্মণ্যবাদী অধর্মের কজায় চলে গেলে বুদ্ধ তা অস্বীকার করেই ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে গেলেন।

৩/ ফ্যারাও সমকালীন জড় ধারণা থেকে আর্থসামাজিক মুক্তিবাচক ধর্ম প্রতিষ্টা করতেই মুসার ঐতিহাসিক এক্সোডাস!

৪/ সেই দর্শন ইহুদি প্রাতিষ্ঠানিকতায় বন্দি হলে ঈশার ধর্ম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ!

৫/ রক্ষণকাম হজরত ঈশার মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করে তাঁর নামেই মিথ বানিয়ে অধর্মাচার শুরু করলে আর্থসামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় অর্থাৎ ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে ইসলামিক জ্ঞান-দর্শন। সেই ইসলামকেও রক্ষণকামিতা 'ধর্ম' বানিয়ে ফেলেছে! অতঃপর 'অস্তিত্ব' এর উত্থান।

কিন্তু রক্ষণকামিতা কম্যুনিজমকে ধর্ম বানাতে পারেনি। না পারলেও সোভিয়েত উত্তর দুনিয়ায় পোস্টমর্ডানিজম (Post Modernism) আর অর্থনৈতিক নিয়তিবাদ (Economic Determinism) তার উপর চাপিয়ে তারও আর্থসামাজিক প্রযোজ্যতা নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। পোস্ট মর্ডানিজমে বহুত্ববাদী বিভ্রান্তিতে মানুষকে সচেতন হতে দেওয়া হয় না। তার চিন্তার কেন্দ্রচ্যুতি ঘটানোয় এই রক্ষণকামী উৎকেন্দ্রিকতার লক্ষ্য। আর ইকনোমিক ডেটারমিনিজম হল চেতনার সক্রিয়তা অর্থাৎ বিপ্লবী হয়ে উঠার তাগিদ নষ্ট করে দেবার জন্য তথাকথিত আদিম সাম্যবাদ-দাস প্রথা-সামন্ত তন্ত্র-পুঁজিতন্ত্রের অনিবার্য পরিক্রমায় অটোমেটিক কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার উদ্ভট কল্পকাহিনি! এই কল্প কাহিনি থেকে মার্কসিজমকেও প্রয়োগিক বিশ্বস্ততা প্রদান করতে পারে 'অস্তিত্ব' দর্শন তত্ত্ব।

রক্ষণকামিতার দোসর হয়ে সামাজিক-আধিপত্যবাদী কিছু স্বঘোষিত কম্যুনিস্ট মার্কসিজমকে ব্ল্যাকমেইল করতে ধর্ম-ধারণার মতই কম্যুনিজমের আলখাল্লাই নিজেদের ঢেকে নিয়ছে। ধর্ম-ওয়ালাদের থেকে এরাও কম জ্বালাতনকারী নয়!

ধর্ম প্রসঙ্গে স্বঘোষিত কম্যুনিস্টরা এমন অবস্থান নেয় যাতে তারা গণবিচ্ছিন্ন অর্থাৎ বস্তুবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। রক্ষণকামিতা তাতে মজা লোটে। জনতাকে নিয়ে লুফালুফি করে। অতএব শখ নাস্তিক্য বা 'ধর্ম' সম্পর্কিত বালখিল্যতা পরিহার হোক।

স্মরণীয় যে, শ্রম-চোর পরগাছামিকে যা এনডোর্স করে তাই অধর্ম। মানবতা বিরোধী যা কিছু তাই নাস্তিক্য।

---


ভয়েস মার্ক
পড়ুন পড়ান
গ্রাহক হোন

# স্বাধীনতার ৭৫ বছর : প্রেক্ষা, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

আযাদ রহমান

## প্রেক্ষাপট

### ১। ব্রিটিশ শাসনের বেসিক নেচার

ব্রিটিশ এসেছিল সাম্রাজ্যবাদী দখলদারি ও শোষণের জন্য। তার শাসনের অন্য সন্দর্ভ ছিলনা। কারুর চোখে সে 'বড় ইংরাজ', 'ছোট ইংরাজ' হলেও। অতি সংক্ষেপে তাদের শাসন ও শোষণের বৈশিষ্ট্য–

ক) বিশ্বের অর্থনীতির সাথে ভারতের অর্থনীতির যোগ সাধন... যার প্রকৃতি পুঁজি কেন্দ্রিক।

খ) ব্রিটেনের শিল্পের সাযুজ্যে ভারতের উৎপাদন কাঠামো ও শ্রমবিভাজন ভারতের উপর চাপিয়ে দেওয়া যাতে ভারতের ভূমিকা সর্বোতভাবে কাঁচামাল যোগানদারের ভূমিকায় সীমাবদ্ধ থাকে।

গ) আর্থনীতিক কার্যক্রমের প্রসারণে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। যেমন- রেলপথের বিস্তার। আর্থিক আয়তন বাড়লে সঞ্চয় বাড়ে। কিন্তু সেই সঞ্চয় সামাজিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে কাজে না লাগিয়ে Social Surplus Drainage to Britain করা।

ঘ) ব্রিটিশ অর্থনীতি ও ব্রিটিশ পুঁজি গোষ্ঠীগুলির স্বার্থে ভারতের আর্থনীতিক পলিসি নির্ধারণ করা।

এই চতুর্বিধ আর্থিক নীতির চাতুরিতে সে মার্কস কথিত ভারতের Asiatic Mode of Production ভেঙে চুরমার করে দেয়। এতে করে Asiatic Societal Pattern ভেঙে যায়। যোগাযোগ-শিক্ষা-শ্রমবিভাজন-শোষণ একটি স্থবির গ্রামীণ অর্থনীতির ভিতকে নাড়িয়ে দেয়। যাতে ব্রিটিশের ভূমিকা দাঁড়ায় ইতিহাসের অসচেতন যন্ত্রের। এই আর্থিক ভিত্তির উপর সামাজিক বিভাজনী কল(সাম্প্রদায়িকতা) চালিয়ে প্রায় ২০০ বছর তার দখলদারি নিষ্কণ্টক করেছিল। তার এই সামাজিক বিভাজনী স্ট্র্যাটেজির দুই মুখ–১/ হিন্দুতে মুসলমানে কম্যুনালিজম ২/ বর্ণ ব্রাহ্মণ্যবাদ উসকে দলিত ও আদিবাসীদের বিচ্ছিন্ন করণ। এভাবেই ব্রাহ্মণ্য প্যাটার্ন ও কাস্ট প্যাটার্ন নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল। যা ১৯৩৫ এর ভারত শাসন আইনে আইনি ভাষ্যরূপে অভিব্যক্ত হয়েছে।

### ২। স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শ

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রাম বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ নিলেও তার বচনকৈবল্য আদর্শের মূল প্রকৃতি ছিল নিম্নরূপঃ-

ক) রাজনৈতিক অর্থনৈতিক স্বাধীনতা খ) আধুনিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন গ) বৈষম্য ও আধিপত্যের সমাপ্তি ঘটানো ঘ) প্রতিনিধিত্ব মূলক গণতন্ত্র ঙ) সিভিল লিবার্টি চ) আন্তর্জাতিকতা ও স্বাধীন বিদেশনীতি ছ) বৈচিত্র্যের স্বীকৃতির মাধ্যমে জাতি গঠন। জ) ধর্মনিরপেক্ষতা। এটি একটি চিত্র। অন্য চিত্রও আছে।

### ৩। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কৌণিক বিন্দু ও নেতাজি এবং কমনওয়েলথ

যে অপর চিত্রটির কথা বলছি তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কৌণিক বিন্দুতে ইতিহাসের বুকে দাফন হয়ে গেছে। সেটি সুভাষ চন্দ্র বসু ও তাঁর আদর্শ। ঔপনিবেশিক রক্ষণকামিতা কীভাবে ধীরে ধীরে হিটলারকে উসকে ফ্যাসি-নাৎসি উৎকেন্দ্রিকতার দেহে মানবজাতির এক নশ্বর শত্রুর জামাটি পরিয়ে দিল ও নিজে তার আড়ালে চলে গেল সেই রহস্যটিই ছিল এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কৌণিকতা। এই যুদ্ধ মানব জাতির সংকটের কোনো মিমাংসা করলো না। তা ভারতের স্বাধীনতার আখ্যানকে গুলিয়ে দিল।

আপোষী নেতৃত্বের ছক্কা-পাঞ্জা ছেড়ে তরুণ রক্ত ছিটকে বেরিয়ে গেল। নেতাজি। কোথায়, কার, কোন সহযোগে দেশকে শৃঙ্খল মুক্ত করা যায় এই একটি মাত্র লক্ষ্য নিয়ে। বিশ্বের পজিটিভ শক্তি তখন সোভিয়েত। সেদিকেই গেলেন। কিন্তু ঐ যে গুলানো ঘেঁটে দেওয়া চাল! যাতে সোভিয়েত বাধ্য ছিল আত্মরক্ষার্থে মিত্র শক্তিতে যোগ দিতে! ফল কী হল তা তো সবার জানা।

পরিণামে ব্রিটিশ লুকিয়ে গেল, ভারতের স্বাধীনতা ও দাসত্বের নয়া সংজ্ঞা এই ক্ষণেই রচিত হল। আপোষী নেতৃত্ব ( জাতীয় কংগ্রেস) রক্ষণকামী নীতি-মিকচারে ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়ে নিল বিভাজনী ট্র্যাজেডি ও সাম্প্রদায়িক হানাহানির সর্বাত্মক নৈরাজ্যের মধ্যে। নেতাজি ও তাঁর আদর্শের অখণ্ড ভারতবর্ষের বিজয় অর্জনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলনা। ছুরিকাঁচির কাটাকুটিতে দুটি দেশ!

স্বপ্নভঙ্গের এখানেই শেষ নয়। যে ছক্কাপাঞ্জা কষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাহিনি চিত্রনাট্য রচনা তা এত সহজেই শেষ হয়? হয়না। সাম্প্রদায়িক বিষ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আড়ালে ব্রিটিশ পুঁজি খাটানোর ব্যবস্থা

করিয়ে নেওয়া হল। ভারতের ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ভুক্তির মাধ্যমে। তার খাতায় কলম রূপদান হল ১৯৪৯ এ নেহরুর ব্রিটিশ কমনওয়েলথ কনটিনিউ করার সনদে স্বাক্ষরের মাধ্যমে। তাতে ঘোষিতভাবেই ভারত ব্রিটিশের এজমালি সম্পত্তি! যা আজও রয়েছে। কেউ কেউ ব্রিটিশের এই কমনওয়েলথ কাণ্ডটিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-২.০ হিসেবেও উল্লেখ করেন। কারণ এই ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ছিল 'to prevent Britain from becoming isolated in economic affairs'। কমনওয়েলথ এর ভারত অন্তর্ভুক্তির লন্ডন ঘোষণা পত্রের বয়ানঃ–

Govt. of India had expressed its acceptance of the king as a symbol of the free association of its independent member nations and head of the common wealth।

পরবর্তী দীর্ঘ সময়জুড়ে ব্রিটিশ পুঁজি কীভাবে এই কমনওয়েলথকে ব্যবহার করে বাণিজ্যের নামে মুনাফা আহরণ করেছে সেই চিত্রটি দেখে নিলেই সম্যক উপলব্ধিতে আসতে পারে, কেন যে-কোনো মূল্যে ব্রিটিশের নেতাজিকে গুম করার দরকার ছিল ।

## স্বাধীন ভারত

এভাবেই ব্রিটিশের দেশ ত্যাগ। কম্যুনাল বিষবৃক্ষ আর সম্পদ শোষণে ছিবড়ে একটি দেশ। আভ্যন্তরিক শক্তি ও দুর্বলতা নিয়ে সামনের দিকে চলতে চাইল। যে দেশপ্রেমিক শক্তি ছিটকে গেল তার কর্তৃত্ব এটি নয়। এটি পন্ডিতি (?) ঝকঝকে কর্তৃত্ব! যে পান্ডিত্যের(?) ভাবাদর্শীয় নির্ভরতা ইউরোপীয় শিক্ষা। যার নাম 'লিবারালিজম'। চিকন নিরাপদ কণ্ঠে মার্কসবাদের ভজনা। এই নিয়েই সংবিধান ও তার আদর্শের বুলি! অর্থনীতিতে সেই মিশ্রতা। মিশ্র অর্থনীতি। প্রাইভেট-পাবলিক। সুভাষ চন্দ্র বসুর সভাপতি পর্বে গঠিত প্ল্যানিং কমিশনের ছাঁচ।

মিশ্র অর্থনীতি মানে প্রাইভেট পুঁজির স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ একই সঙ্গে। কিন্তু চিকন কর্তৃত্ব কর্তৃক যে সোভিয়েতের এত গুণ গাহানো হল তার পরিকল্পিত অর্থনীতি গৃহীত হল না! কেবল ছাঁচ!

প্রসঙ্গত, পরিকল্পিত ও মুক্তবাজারী অর্থনীতির পার্থক্যটি উল্লেখ করা দরকার। পরিকল্পিত অর্থনীতি উৎপাদনের উপায়গুলিকে সামাজিক মালিকানায় নিয়ে নেয়। আর্থসমাজের প্রয়োজনের এসটিমেট-নির্ভর বিভিন্ন ক্ষেত্রীয় উৎপাদন পরিচালিত হয়। আবশ্যিক ও উদবৃত্ত মূল্যের বিভাজন রেখা পরিষ্কার থাকে। উদবৃত্ত মূল্য আর্থসামাজিক সম্পদ রূপে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় গৃহীত হয়, ব্যক্তি কুক্ষিতে পড়ে না। তা পুনর্বিনিয়োগে নতুন শ্রমক্ষেত্র রচিত হয়।

অন্যদিকে মুক্তবাজার অর্থনীতি ব্যক্তিমালিকানায় মুনাফা নির্ভর কাণ্ড কারখানা! যাতে শ্রমিকের আবশ্যিক মূল্য মজুরি নামাঙ্কিত। উদবৃত্ত মূল্য ব্যক্তিমালিকানায় কুক্ষি হয়ে যায়। আর্থসামসজিক সম্পদের ধন রূপে এই কেন্দ্রিকরণ আর্থসামাজিক বিকাশের পথরোধ করে।

মিশ্র অর্থনীতিতে এখানে যা হল তাতে ব্যক্তি মালিকানায় অর্থনীতির পুরোটায় ছেড়ে রাখা হল। শুধু একটু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হল পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে। মানে আমরা কোন খাতে বিনিয়োগ করতে চাই, শিল্প নাকি কৃষি, না অন্য কোনো খানে– তার দিক নির্দেশনা। আর কিছুটা রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের মাধ্যমে পাবলিক উৎপাদনী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। যার প্রধান দিক ছিল ভারী শিল্প ও কৃষির উন্নতি। এই ব্যাপার। যেখানে শোষণ বঞ্চনা প্রতিরোধে ব্যক্তি পুঁজির উপর লাগাম কষার খুব প্রভিশন-ইচ্ছা-অভীপ্সা কিছুই ছিলনা। ১৯৪৭ পরবর্তী পুঁজির বৃহৎ গোষ্ঠীগুলির সমকালীন টার্নওভার সমীক্ষা করলেই যা ধরা পড়ে। নেহেরু জমানার শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনগুলি পর্যবেক্ষণ করলেও ব্যাপারটি ধরা পড়বে।

যাইহোক, এই করেই ১৯৪৭-১৯৬৫ প্রথম ফেজ ও ১৯৬৫-১৯৯০ দ্বিতীয় ফেজ মিশ্র অর্থনীতির কালপর্ব অতিক্রম করে। এই ৪৩ বছরের মিশ্র অর্থনীতির যতটুকু পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ অর্থনীতির উপর ছিল তাতেই শিক্ষা-স্বাস্থ্য-শিল্প-কৃষি-মহাকাশ-প্রতিরক্ষা ইত্যাদির বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠেছিল। এই পজিটিভসগুলি লিস্টিংও করা যায়। আর্থিক সংহতি ও জাতীয় সংহতি, 'ধর্মনিরপেক্ষ' সংবিধান, পঞ্চায়েতি রাজ, জাতীয় ইউনিভার্সিটি ও আই আই টি, সবুজ বিপ্লব, ইসরো মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষার অধিকার, তথ্যের অধিকার, হোয়াইট বিপ্লব, পোলিও দূরীকরণ, হোমোসেক্সুয়ালিটি অপরাধ-মুক্ত করণ, ১৯৮৪ এর টেলিকম বা আইটি বিপ্লব, জাতীয় নিরপত্তা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

এর সাথে যুক্ত হতে পারে আরো কিছু উন্নয়ন চিত্র। যেমন–১. অর্থনীতির আয়তন: 1960 সালে GDP ছিল ৩০.৬ বিলিয়ন আমেরিকান ডলার। ২০২০ তে

তা ২.৬ ট্রিলিয়ন আমেরিকান ডলার। ২০২৫ সালে তা হতে পারে ৫ ট্রিলিয়ন ( লক্ষমাত্রা)। ২. গড় আয়ু: ১৯৫০ এ ছিল ৩৩.৯৪ বছর। আর ২০২০ তে তা ৬৯.২৭ বছর। ৩. শিশু মৃত্যুর হার: ৫ বছরের নিচে শিশুমৃত্যু ১৯৫০ এ ছিল ২৬%। যা ২০১৯ এ ৩.৪%। ৪. জাতীয় সড়ক নির্মান: ১৯৫০-৫১ তে ছিল ২০ হাজার কিমি। ২০২০-২১ তা ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৩২ কিমি। ৫. টাকার মূল্য শূন্য থেকে যা আজ ( ৫ আগস্ট, ২০২১) প্রতি ডলার ৭৪.১৮ টাকা।

এগুলি অ্যাচিভমেন্ট নাকি উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের স্বাভাবিক পরিণতি? তা অবিতর্কিত নয়। তবে নি:সন্দেহে রাষ্ট্রীয় আর্থনীতিক উদ্যোগ একটি ভূমিকা নিয়েছে। বিশেষ করে জাতীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে। শিল্প বিকাশে, কৃষির উন্নয়নে।

## বিশ্বায়নী মুক্তবাজার অর্থনীতির পর্ব (১৯৯১-২০২১)

এটিকে দুটি ভাগে ভেঙে নিলে সুবিধা। ১৯৯১-২০১৩ একটি আর ২০১৪-২০২১ আর একটি। কারণ শেষেরটি ইউনিক। ভারতের রাজনৈতিক-অর্থনীতির ইতিহাসে এর জুড়ি মেলা ভার।

নেহেরু পিরিয়ডের ভিত্তিভূমি আর পরবর্তী ইন্দিরা ও রাজীব জমানার সেই ভিত্তি ধরে চলার মধ্যে অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতভাবে আর্থসামাজিক শ্রেণিবৈষম্যে একটু লাগাম রেখেছিল। কিন্তু শিল্প পুঁজির বাজার সংকট মেটাতে হোম মার্কেট খোলার উদ্দেশ্যে কৃষিকে শিল্পনির্ভরতায় নেবার লক্ষ্যে Green Revolution করা হল। যা আদপে রাসায়নিক কৃষির সূচনা। রাসায়নিক সার-সেচ ও রাসায়নিক কৃষি বিষের ব্যবহারেই এই শিল্প কৃষির উদ্ভব। কৃষিতে শিল্প পুঁজির বিনিয়োগ। শিল্পপুঁজির বাজার মুক্তি এভাবেই ঘটলো। কৃষির কী হল? ব্যাপক উৎপাদন তথা ফলন বৃদ্ধি হল। কিন্তু দাম নেই। কৃষকের হাত শূন্য। কৃষি এভাবেই ছিবড়ে হল ক্রমশ। এর আরেকটি সাইড এফেক্ট হল রাসায়নিক ব্যবহারের রমরমায় জল-জমি তথা পরিবেশের ব্যাপক দূষণ। স্বাস্থ্য হানি।

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির আওতায় ভারী শিল্পে বিনিয়োগ ব্যয় বহনে রাষ্ট্র ক্রমশ অক্ষম হতে লাগল। অন্যদিকে বিশ্বায়িত পুঁজির চাপ ক্রমশ বাড়তে লাগল। এই চাপ বিশ্বব্যাঙ্ক ও আইএমএফ এর মাধ্যমে আসছিল। যাতে ছিল কৃষিতে ভর্তুকি কমানো আর ভারতীয় বাজার বহুজাতিকের কাছে উন্মুক্ত করার দাবী।

এই প্রেক্ষায় ১৯৯০-৯১ সালে নরসিমা রাও এর প্রধানমন্ত্রীত্বে ও ড. মনমোহন সিংহের অর্থমন্ত্রীত্বে বিশ্বায়নী মুক্তবাজার অর্থনীতিকে আবাহন করা হল। এর মোদ্দা যুক্তি হল আর্থিক বৃদ্ধি। তরতর করে বৃদ্ধি। ভারতের বিশ্বগুরু(!) হবার লক্ষ্যে সগর্ব পদক্ষেপ। পুঁজির এই যুক্তি ২০১৩ পর্যন্ত কার্যক্ষেত্রে (বৃদ্ধির মানদন্ডে) পরিলক্ষিতও হচ্ছিল।

মুক্তবাজার অর্থনীতিতে আর্থিক বৃদ্ধি GDP এর হিসেবে হয়। এই বৃদ্ধি একদিকে, অপরদিকে দারিদ্র্য ও আর্থসামাজিক জীবন-মানের অবনমন। বিশ্লেষণে এটাই পাওয়া যায় যে, বৃদ্ধি দারিদ্র্য কমাবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। তবে পুঁজির অর্থনীতির ভাষায় Trickle down থিয়োরিতে ছিটেফোঁটা গড়িয়ে আর্থসমাজের নিচে নামতে পারে। আগে বলা হত ৪% বৃদ্ধি হলে ২% নতুন কর্মসংস্থানে ব্যয় হয়। এখন ৮% বৃদ্ধি হলেও ০.৫% কর্মসংস্থান ক্রিয়েট হয় কিনা সন্দেহ। মানে আর্থসামাজিক সম্পদের ব্যক্তিকুক্ষির মাত্রা ক্রমশ বাড়তে লাগলো। ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে আর্থিক বৃদ্ধির সমান্তরালে জনবাদী রাজনীতি সক্রিয় ছিল। যার ফলে নানান সামাজিক প্রকল্প যেমন এনআরইজিএ, জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা মিশন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্যভাবে সেই 'চুঁইয়ে পড়া' নিয়মে নিচেও নামছিল।

তবু বেসিক অর্থনীতির সেন্স এটাই বলে, যে-পুঁজি মুনাফার হার অসম্ভব পরিমাণে বাড়াতে চায়, তার লাগাম না থাকলে সে নিজেই বাজার সংকটে পড়ে। কারণ মুনাফার হার বাড়া মানেই শোষণের মাত্রা বাড়া। অর্থাৎ আর্থসামাজিক সম্পদের আরো কেন্দ্রীভবন। ফলে জনতার হাতে টাকা না থাকা। অর্থাৎ তাদের ক্রয় ক্ষমতা না থাকা। ফলে পুঁজির কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা সংকট! অতএব তার দরকার নিত্য নিত্য নতুন নতুন বাজার। তাই জন্য দেশীয় পুঁজিকে আর দেশীয় থাকলে চলে না। তাকে গড়ে তুলতে হয় MNC। মাল্টি ন্যাশনাল কর্পোরেশন। তাতেই কি তার মুক্তি ঘটে? ঘটে না।

সেই পুঁজির বাজার সংকটের প্রাককালে ইউপিএ-২ এর শেষে মনমোহন সিংহের সরকার সেই কর্পোরেট পুঁজির নীতি-পঙ্গুত্ব অভিযোগে পড়ে ক্ষমতা হারায়। সেই কর্পোরেট পুঁজিই গুজরাত দাঙ্গায় অভিযুক্ত বিতর্কিত রাজনীতিক নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদির ইমেজ বিল্ডিং করে তাঁকে ক্ষমতায় আনলো ২০১৪ সালে।

## মোদি পর্ব (২০১৪-২১): অর্থনীতির চিত্র

এটি আর্থিক উদারীকরণ পর্বের আওতার মধ্যে পড়লেও আলাদা সাব হেডিং এর দাবি রাখে। কারণ ভারতীয় পলিটিক্যাল ইকোনমির ইতিহাসে এটি একটি ইউনিক পর্ব। যা আগেই বলা হয়েছে।

২০১৪-২১ পর্বে মুক্তবাজার অর্থনীতি যেভাবে ফাংশন করেছে তা ইতিপূর্বে কখনো ঘটেনি। এই পিরিয়ডে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি ভারতের ইতিহাসে বিরল। মধ্যরাত্রীর হঠাৎ সিদ্ধান্তে নোটবাতিল (নভেম্বর, ২০১৬)। জিএসটি অর্থাৎ গুডস এন্ড সার্ভিস ট্যাক্সের যাচ্ছেতাই প্রয়োগে ছোট ও মাঝারি ব্যবসার অন্তর্জলি যাত্রা। মহামারির প্রেক্ষাপটে প্রস্তুতিহীন সারাদেশব্যাপী নৃশংস লকডাউন (২০১৯)। এবং তার পর মহামারি কোভিড-১৯ এর তাণ্ডব।

কোভিড পূর্বেই অর্থনীতির বারোটা বেজেছিল। ৪৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বেকারত্ব। সরকারি জাতীয় স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা হরণ। তথ্যের আইন ক্রমেই রিডানড্যান্ট করে দেওয়া। সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা হরণ। গুটি কয়েক সরকার পোষিত কর্পোরেট গ্রুপের হাতে দেশের সিংহভাগ সম্পদ কুক্ষি হওয়া। ধন-বৈষম্য আকাশ ছুঁয়ে ফেলেছে। কোভিড মহামারির মত বছরে এই কর্পোরেটগুলোর ব্যাপক মুনাফা। এদের সব ধরনের ছাড়। ব্যাঙ্ক লুঠ। আর্থনীতিক সংস্কারের নামে একের পর এক জাতীয় সম্পদ বিক্রি করে দেওয়া। এইগুলি গত ৭ বছরের ঘটনা।

১৯৯১ সালে আর্থিক সংস্কারের নামে বিশ্বায়নের পলিসিগুলি মেনে নেবার ফলে ভারতের বাজার বহুজাতিকের কাছে মুক্ত হয়ে গেছিল। কিন্তু লাইসেন্স পারমিট রাজ তথা ব্যুরোক্রাসির লালফিতের ফাঁস মুক্ত হওয়াতে অর্থনীতির পুঁজি কেন্দ্রিক মুক্তি হবার ফলে GDP ক্রমশ বাড়ছিল। মানে অর্থনীতির আয়তন বাড়ছিল। ইউপিএ-১ ও ইউপিএ-২ এর কংগ্রেসি জমানায় GDP বৃদ্ধি পৃথিবীর তাবড় তাবড় অর্থনীতিকে টেক্কা দিচ্ছিল। এতে করে কমপক্ষে আর্থিক মন্দাজনিত প্রতিক্রিয়া হিসেবে জনতাকে অতিরিক্ত বোঝা বহন করতে হচ্ছিল না। যদিও শ্রমমুক্তি বা জীবনমুক্তি অসম্ভ ছিল। তথাপি নাভিশ্বাস ছিলনা। চুঁইয়ে কিছুটা নিচেও নামছিল, যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদার দাস মোদির এত নিত্য-নতুন (অবিমৃশ্যকারী) কাণ্ডকারখানা সত্ত্বেও আর্থিক বৃদ্ধি তলানিতে চলে গেল। ক্রয়ক্ষমতা না থাকায় পুঁজি বিনিয়োগ কমলো। নিযুক্তি কমলো। বরঞ্চ লক্ষ লক্ষ কর্মহানি ঘটল। বাজার স্তব্ধ। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। পেট্রোপণ্যের আকাশ ছোঁয়া দাম। ডিজেল পেট্রোল লিটার প্রতি দাম ১০০ টাকা ছাড়িয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক বাজারের স্থিতিশীলতা সত্ত্বেও। কৃষিক্ষেত্র ছাড়া প্রতিটি ক্ষেত্রে গতবছর ঋণাত্বক বৃদ্ধি রেকর্ডেড হয়েছে। বিশ্বগুরু (!) হবার দৌড় থেকে এক ধাপে খাদের কিনারায়! উল্লেখ্য যে, বৃদ্ধি বাড়লে জনতার লাভ না হলেও, বৃদ্ধি ব্যহত হলে ক্ষতির বোঝা নিতে হয়। মুক্তবাজার অর্থনীতির এটিই দস্তুর!

## মোদিপর্ব (২০১৪-২১): আর্থসমাজ সংস্কৃতির চিত্র

২০১৪ সালের পূর্বে কেন্দ্রের ক্ষমতাসীনরা সংবিধান বর্ণিত প্রধান বিষয়গুলিকে মান্যতা দিয়ে শাসন চালাতেন। সামাজিক-প্রশাসনিক সেই সাংবিধানিক নৈতিকতা তারা মানতেন।

যেমন বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বা ধর্মীয় বিভাজন প্রসঙ্গে কিম্বা আঞ্চলিক বা ভাষাগত বিভাজনের প্রসঙ্গে ক্ষমতার শীর্ষে থাকা ব্যক্তি সাংবিধানিক দিকটি রক্ষা করতেন। কিন্তু এই প্রথম এমন এক ক্ষমতা-চরিত্র কেন্দ্রে আসীন হল যার নেতৃত্ব স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে উঠে আসা নীতিগুলিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে চলেছে। ভিশন ডকুমেন্ট হিসেবে প্রণীত সংবিধানে যে মানবিক মর্যাদার কনসেপ্টটিকে সর্বোচ্চে স্থাপন করা হয়েছিল বর্তমান ক্ষমতা তার ধ্বংস সাধনে সচেষ্ট!

ধর্ম ভিত্তিক উগ্র জাতীয়তাবাদ আর সরকার পোষিত ক্রোনি-কর্পোরেটকে যেনতেনপ্রকারেণ গার্ড করা– এই দুইকে তারা অঙ্গাঙ্গী ভাবে বহন করছেন। যাবতীয় অর্থনৈতিক ব্যর্থতাকে কম্যুনালিজমের ডিভিশনে চাপা দিয়ে পুতুল সংবাদ মাধ্যমের প্রোপাগ্যান্ডায় জনতাকে বিভ্রান্ত করে দাও! নির্বাচন এগিয়ে এলে জাতীয়তা উসকানো কোনো ঘটনা চলকে উঠুক! সব কিছুতেই হিন্দু-মুসলমান বাইনারি নিয়ে এস! প্রতিনিয়ত মিথ্যা প্রচারণা চালাও! দোসর প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাথে নয়া সঙ্গী ইন্টারনেটমিডিয়া ও তার পেশাদার ট্রোলস! আর সোশ্যাল মিডিয়ার সেই ট্রোল বাস্তবের রাস্তায় নেমে মবলিঞ্চিং ঘটাচ্ছে!

আজ যেন ভারত শাসন আইন ১৯৩৫ এর পুনরাভিনয় চলছে! বিষ, বিষ আর বিষ! ঘৃণা, ঘৃণা আর ঘৃণা! লিমিটেড ডেমোক্রাসি! সাম্প্রদায়িকতার গভীরতর

বিষের প্রতিক্রিয়া ধর্মান্তর করণ-পুনর্ধর্মান্তর করণ, পবিত্র গরু বনাম নিষিদ্ধ শুয়োর, কোন পুস্তিকা কোন সম্প্রদায় এর ভাবাবেগ আহত করে, রাষ্ট্র কোন সম্প্রদায়কে তোল্লায় দিচ্ছে, আন্তধর্ম বিবাহ বিরোধিতা ইত্যাদি ১৯৩০ এর দশকটিকে বিকৃত করেছিল। হিন্দু মুসলমান সামাজিক ও বৌদ্ধিক বিভাজন নতুন মাত্রা পাচ্ছিল। যারা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছিল তারাই ভ্রাতৃঘাতি হানাহানিতে লিপ্ত হতে শুরু করল! বিভাজনের প্রতিযোগিতা যেন! উগ্র জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িক আত্মরতি অতি সাধারণ ব্যাপার হিসেবে দেখা দিল। এইভাবে সেই বিষ জাতীয় জীবনকে গ্রাস করে নিলে সমকালীন উজ্জ্বলতম ব্যক্তিত্বরাও যেন তার সামনে অসহায় হয়ে পড়েছিলেন! কিন্তু তারপরেও স্বাধীনতা এল। দুটি দেশ। দুটি নতুন দেশ। একটি চলল বিভাজনী এজেন্ডা নিয়ে। ভারত চাইলো নতুন করে শুরু করতে। অনেক দূর এগোনো গেল। ভাষা-ধর্ম-জাতি-উপজাতি স্বীকৃতি অস্বীকৃতি দারিদ্র্য ইত্যাদি নিয়েই চলল।

কিন্তু তার মুক্তমনা আদর্শগুলি ছাড়লো না। সামাজিক গণতন্ত্র বাধাপ্রাপ্ত হল, জরুরী অবস্থা হল, প্লুটোক্রাসি, ব্যুরোক্রাসি, হায়ারার্কি তা দখল করে নিতে চাইলো। কিছুটা করেও নিল। কিন্তু তবুও সামনের দিকে এগিয়ে যাবার স্পৃহাটি থামলো না। ব্যক্তিমালিকানা নির্ভর শ্রমার্থনীতি আর মুক্তমনা সামাজিক আদর্শগুলির বৈপরিত্য নিয়ে এগুতে এগুতে অনেক দূর এল। সেই বৈপরীত্য বিশেষিত অভ্যন্তরের নগ্নতা হঠাৎ করেই ২০১৪ নাগাদ সমস্ত পোশাক খুলে বে-আব্রু হয়ে গেল! অত:পর আগের অনুচ্ছেদে বর্ণিত ১৯৩০ এর দশকের শক্তিশালী পুনরাভিনয়ে সেই একই এজেন্ডা–গো-রক্ষা, লাভজিহাদ, ঘৃণার আরো কত নতুন নতুন অজুহাত। বিভাজন যার সার বস্তু! সেই দশকের থেকে যা ব্যতিক্রম তা হল তখন সেগুলি ঘটেছিল নেতৃত্বহীন একটি পর্যায়ে, কিছুটা পরিমানে। এখন ক্ষমতাসীন দেশনেতারা সেগুলির নেতৃত্ব দিচ্ছেন আর তার বিস্তার সারা দেশব্যাপী !

## 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' নীতিতে জাতি গঠনের ব্যর্থতা

স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে উঠে আসা নীতিগুলির সারার্থে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য নীতি সাংবিধানিক প্রধান স্তম্ভ। অসংখ্য 'ধর্ম', ভাষা, খাদ্যাভাস, আঞ্চলিকতার স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে নিয়েও 'ভারতীয় জাতীয়তা' গঠনের প্রয়াস যে ব্যর্থ হয়েছে তার প্রমাণ দেশের বর্তমান ক্ষমতা-চরিত্র। যার বৈশিষ্ট্য আগের অনুচ্ছেদেই উল্লেখ করা হয়েছে।

কেন এমন হল? এর কারণ অনেকগুলি–

**১) মুক্তবাজারী শ্রমার্থনীতি বনাম মুক্তমনা আদর্শবচনের বৈপরীত্য**

এর ফলে হাজার হাজার ভালো কথা থাকলেও শ্রমার্থনীতিগত কর্মসূচি না থাকায় 'সেগুলি খায় না মাথায় মাখে' অর্থাৎ জনমনে তা ভ্যালু হারায়। দীর্ঘ বছর জুড়ে তা হারিয়েছে। শ্রমনীতিতে ব্যক্তিমালিকি ক্ষমতা বজায় থাকলে আর্থসমাজ শ্রেণিতে বিভক্ত হয়। একদিকে ধনের বিলাস অন্যদিকে দারিদ্র্যের নোংরা। অধিকার রাজনীতি ও তার অনুশীলন না থাকায় 'ডোল পলিটিক্সে'র বদান্যতা! ফলে ঔচিত্য বোধের নাগরিক চরিত্র গড়ে উঠলো না। নাগরিক ঔচিত্য বোধ না থাকলে আদর্শ বচনের সারবত্তা অর্থহীন। অর্থাৎ যাদের মানবিক মর্যাদায় গড়ে উঠতে দিলাম না, তাদের থেকেই আজ সেই বচন-কৈবল্য বিধান রক্ষার আশা করছি!

**২) ভারতীয় ধাঁচের 'ধর্মনিরপেক্ষতা'**

এটি একটি কারণ। কারণ এর সংজ্ঞার্থের মধ্যেই নিহিত মেজরিটি প্রাধান্যের বিপদ। হয়েওছে তাই। যার ফলে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা কম্যুনালিজমের বিষবৃক্ষটি জনসংঘ-আরএসএস-বিজেপির হাতে মওকা পেতে পেতে মহীরূহ হয়েছে। সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতা তাকে মদত জুগিয়েছে। রাষ্ট্র প্রথাপালনী ধর্মের ব্যাপারটিকে ইউরোপীয় কায়দায় মোকাবিলা করলে সমস্যা এড়াতে পারলেও পারত।

**৩) ইউরোপিয় 'লিবার্যালিজম' দিয়ে জাতি গঠনের প্রয়াস**

যা প্রধানত জওহরলাল নেহেরু ইউনিভার্সিটি ও দিল্লি ইউনিভার্সিটির মত প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বেড়ে উঠেছিল। গত ৭৫ বছরে এই লিবার‍্যাল ছকের চিন্তার প্রতিনিধিত্ব করছে এই ইউনিভার্সিটিগুলি। এখান থেকে বেরোনো ছাত্ররাই প্রশাসন বা রাজনীতির নেতৃত্ব করেছে। কিন্তু তা সত্বেও কখন যে ব্যাটনটি তাদের হাত থেকে বেরিয়ে উগ্র সহিংস হিন্দুত্বের জাতীয়তাবাদী হাতে চলে গেছে তারা ধরতেই পারেননি। কেন পারলেন না?

এই না পারাটা আসলে ইউরোপীয় চোখে ভারতীয় জীবনবোধ তথা জীবন দর্শনকে দেখার ফল। যে চোখ এই জীবনবোধের নির্যাস রূপ জীবনসূত্রগুলিকে 'মিথ' বলে বাতিল করে দেয়। রামায়ণ ও মহাভারতীয়

সাহিত্য বাস্তবতাকেও তার সীমিত চোখে একই অভিধা দিতে চায়। যেখানে সেই রামায়ণ, সেই মহাভারত ভারতীয় জীবনধারায় প্রাণরস যুগিয়ে চলেছে শতাব্দী শতাব্দী ভর। তার সারবত্তা এই চোখ কোনো দিন উপলব্ধি করতে পারেনি। এই ইউরোপীয় চোখ কতগুলি ধার-করা বচনকৈবল্যে নেশন গঠনের ডাক দিলেও ভারতীয় জনতা তাকে আপন করতে পারেনি। কারণ তাতে মগজের কাজ-কারবার কিছু থাকলেও হৃদয়-রস ছিলনা। তাই তা অধরাই রয়ে গেছে।

বরং এই বিচ্ছিন্নতার ফাঁক গলে উগ্র হিন্দুত্ব মার্কা চন্ড জাতীয়তাবাদ এ-দেশের এ-মাটির জীবন ধারার ঠিকাদার বনে যায়। একটি উদাহরণঃ যে 'গো-তত্ত্ব' জীবনাদর্শ রূপে জনপদকে পথ দেখায় তার চর্চা রহিত হয়ে গেলেও 'গো' কথাটি তো জনমন থেকে সরেনি। অতএব সেখান থেকে 'গো-রক্ষা' লিংক জুড়তে খুব বেশি কাঠখড় পোড়াতে হয় কি? এরকম করেই দর্শনের 'শব্দ-বাক্য পরিভাষা' দখল ও ব্যবহারের মাধ্যমে সেই উগ্রতা প্রথমে সমাজ পরিসর এবং ক্রমে রাষ্ট্রীয় পরিসর দখল করে নিয়েছে, নিচ্ছে! আর তাতে, সেই বচন-কৈবল্যের লেফট-লিবার্যাল অভিব্যক্তিতে আহা! বিধান গেল, বিধান গেল করলে তো ছাড় পাওয়া যাবে না!

একইভাবে সেই ইউরোপীয় জড়-চোখ ইসলামকেও দেখেছিল। যা তার কাছে 'পলিটিক্যাল ইসলাম' আর 'সুফি ইসলামে'র বাইনারিতে প্রথাবদ্ধতার রূপ ছাড়া আর কিছু বলেও প্রতিভাত হয় নি। ইসলামের ফিলসফিকে জীবন থেকে ছেঁটে কীভাবে তাকে প্রথাবদ্ধ ধর্মে রূপ দেওয়া হল সেই চোখ তার হদিস রাখে না। কিন্তু প্রথা-রূপ সেই অনড়তা তার সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করলে তখন সে তাকে অন্যের চোখে দেখা আর অন্যের মুখে ঝাল খাওয়া বিশেষণে বিশেষিত করে। লাভ কিছু হয় না।

অথচ ভারত জিজ্ঞাসার আধুনিক ব্যক্তিত্ব রাজা রামমোহন রায় সেই উনবিংশেই তো ভারতীয় আর ইসলামিক ফিলসফিকে আইডেন্টিফাই করেছিলেন 'ব্রহ্মাবাদ' তথা একেশ্বরবাদ বলে! এবং সামাজিক সংস্কারের স্তুপের উপর বসেও তা থেকে আর্থসমাজকে বের করে আনার প্রয়াস করেছিলেন। সামাজিকভাবে ব্যর্থ হলে ব্রিটিশ রাষ্ট্রকে কাজে লাগিয়ে সমাজ সংস্করণে ব্রতী হয়েছিলেন!

**৪) বৈধানিক স্থবিরতা**

বিধান বা গাইডলাইন হল লাইভ ডকুমেন্ট। যা প্রতি নির্বাচনী মেয়াদে বিবর্তিত হবার কথা। যাতে জেনারেশনের দাবী পূরণ হয়। জেনারেশন গ্যাপ তথা জীবন-গ্যাপ না হয়! কিন্তু সেই বৈধানিক বিবর্তনশীলতা টেক আপ করা হয়নি। তাতে তাকে তুলে রাখার শাস্ত্ররূপ অনড়তা আরোপ করা হয়েছে। ফলত জনমানসের জীবন-যন্ত্রণার নিরসনে তার গাইড-লাইন রূপ ভূমিকা কিছুই অবশিষ্ট থাকে নি। এতটাই জীবন গ্যাপ! তাই সেই বিধানে সংরক্ষিত নীতিমালা চন্ড-শক্তি যখন একের পর এক ধ্বংস করতে থাকে তখন বিধান রক্ষা কর, বিধান রক্ষা কর বাম-ডান চিল্লানিতে গণজনতার কিছুই আসে যায় না!

**৫) জাতপাতের রাজনীতি**

গণতন্ত্রের নামে জাতপাতের অপরাজনীতি সেই বিধানকে আরো চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দেয়। রাজনীতি সেই বিধানের সহযোগিতা নিয়ে জাত-বর্ণের উচ্ছেদ করেনি। করতে চায়নি।

এভাবেই, আর্থিক সংস্কার কর্মসূচি পরবর্তী সময়ে পুঁজি তথা প্রো-কর্পোরেট পলিসি নেবার পরিণামে ব্যাপক জনতার জীবন মানের সাথে সেই লিবার্যাল ভাবাদর্শের বিরোধ-বৈপরীত্যে আর্থসমাজে প্রতিকারহীন শক্তের যে অপরাধ সংঘটিত হয়ে চলছিল তারই ফাঁক গলে ধর্মান্ধ-উগ্র জাতীয়তাবাদী চন্ডশক্তি প্রথা সর্বস্ব ধর্মধারণার জড়িবুটির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় জীবনে যা কিছু ইতিবাচক তার বিনাশ সাধনে উদ্যত হয়েছে। কমন ম্যাস তাকে স্বাগত জানাচ্ছে! বর্তমান অথরিটারিয়ানিজম ভবিষ্যতে ফ্যাসিজমে টার্ন নিলেও অবাক হবার কিছু নেই। কারণ জমি আছট পড়ে থাকলে তাতে আগাছা জন্মাবেই। আধাসামন্ত-আধাপুঁজি হয়ে ক্রমেই শিল্প পুঁজির আধিপত্য এবং পরবর্তীতে কর্পোরেট পুঁজির লাগামহীনতায় ভুক্তভুগি তো সেই জনতাই! তার নামেই বচনকৈবল্য বৈধানিক আদর্শ, তার নামেই ডোল! কোথায় ভ্যানগার্ড পলিটিক্স? কোথায় নেতৃত্ব? পরিণাম যা হবার তাই!

## ভবিষ্যতের হাইপোথিসিস

কর্পোরেট শোষণ-শাসনী বাস্তবতার চিত্র এখন আটপৌরে। 'গণতন্ত্র' দিয়ে অথরিটারিয়ান কর্পোরেটসেবি ক্ষমতাকে রোখা যাচ্ছে না। ধর্মের নামে বিভাজন তার ছেদবিন্দুর প্রান্তদেশের দিকে এগুচ্ছে। মাইনোরিটি ও তার নাগরিকতা সংকটের মুখে। বচন কৈবল্য বিধানটিতে সম্প্রতি বিভাজনী নাগরিক আইন সহ আইনের নামে শ্রম-বিরোধী বহু কিছু ঢোকানো হয়েছে!

অত:পর জীবনের গাইড লাইন? ইডিওলজি? কম্যুনিজমের থিয়োরিতে দলগঠন করা লোকগুলি বাম নামের যে রাজনৈতিক ট্র্যাডিশনের জন্ম দিলেন তার হাল নেহেরু-নীতির হালের মতই দাঁড়িয়েছে। ৭৫ বছরের ইতিহাস পরিক্রমায় ধৃতরাষ্ট্রিক অন্ধত্বই যেন তার ফিগারের পরিহাস! কারণ মুখে যাই হোক কার্যত তা আঞ্চলিক আর পাঁচটা 'গণতান্ত্রিক' দলের থেকে বেশি কিছু নয়। রাজ্য শাসনে মার্কসবাদ সেখানে কেবলই সাইনবোর্ড। প্রকারান্তরে যা মার্কসবাদের সাথেই ব্ল্যাকমেইল!

উদ্যত 'গুজরাট-মডেল' এর সামনে কোন মতাদর্শীয় হাতিয়ার নিয়ে খাড়া হতে পারি অতঃপর? তা আমিত্ব-সংগ্রাম তত্ত্ব। যার মূল কথা জ্ঞান-বিশ্বাস-সংগ্রাম। কীসের জ্ঞান? ব্যক্তি ও সমাজ সত্তার জ্ঞান। অর্জিত জ্ঞানের শক্তিতে সংগ্রাম। সংগ্রামের প্রতিপক্ষ কে? আত্মকেন্দ্রিকতা এবং আত্মবিকেন্দ্রিকতা। আত্মকেন্দ্রিকতাতেই আর্থসামাজিক সম্পদ ধন রূপে ব্যক্তি কুক্ষিতে ঢুকে যায়। যেখান থেকেই মুক্তবাজারী ড্রাগনের ভ্রূণ গজানো। অর্থাৎ আত্মকেন্দ্রিক মেরুতেই কর্পোরেট পুঁজির আঁতুড় ঘর। শ্রমমূল্যের এই ব্যক্তিমালিকানায় কুক্ষি থেকেই শ্রেণি সমাজের বাস্তবতা।

আত্মবিকেন্দ্রিকতাতেই নিহিত আর্থসমাজ তথা জীবনমুক্তি। ব্যক্তি ও সমাজের বিকাশ। উল্লিখিত শ্রেণি সমাজের উৎখাতে আর্থসমাজের পুনর্গঠনের জন্য অতঃপর প্রয়োজন ঐতিহ্যের ধারণা মুক্তি এবং জড় আকর্ষণ মুক্তি। চেতনায় রা-ধা ('রা' অর্থে মুক্তি, 'ধা' অর্থে অধিষ্ঠান) প্রযুক্তি ব্যতিরেকে যা সম্ভব নয়। তারই তত্ত্ব-কাহিনি মহাভারত। এই মহাভারত তত্ত্বের বাস্তবায়নেই আর্থসামাজিক দুর্যোধন (পড়ুন ধনের আবর্জনা) পরাজিত হয়। তার জন্য কুরুক্ষেত্রের লড়াই। আর তাতে পান্ডব আর কৌরবের আর্থসামাজিক মেরুকরণ। পান্ডব অর্থে সমকাল বিকাশনী শক্তি। আর কৌরব অর্থে সংকোচনী বিকাশ বিরুদ্ধ শক্তি। এই দুই শক্তির দ্বন্দ্বের মিমাংসাতেই আর্থসমাজের শান্তি স্বর্গ যা শ্রম প্রয়োগ-মূল্যবিভাজন-মূল্যবিন্যাস প্রজ্ঞার সমকালীন বাস্তবতা। কোনো কল্প স্বর্গের অতৈন্দ্রিক কল্প-বিলাস নয়। সেই বাস্তবতাতেই আর্থসমাজের অগ্রগমন যা দ্রৌপদী। সেই অগ্রগমনশীলতার ভোক্তা হল আর্থসমাজ।

সেই অগ্রগমনশীল আর্থসমাজ আমরা গঠন করতে চাই কিনা, তার উপর নির্ভর করছে আমাদের ভবিষ্যৎ।

## সূত্র নির্দেশিকাঃ

১। India After Independence 1947-2000 Bipan Chandra Mridula Mukherjee Aditya Mukherjee; Penguin

২। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস – ইএমএস নাম্বুদিরিপাদ; ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

৩। স্বাধীনতার মুখ – অমলেশ ত্রিপাঠী; আনন্দ পাবলিশার্স

৪। অস্তিত্বঃ প্রবেশিকা (২১টি প্রবন্ধ); গাইডেন্স ফাউন্ডেশন

৫। Economic History Of India Under Early British Rule; 1901–Ramesh Chundar Dut-ta

৬। Indian Express 15th August 2021

৭। Hindustan Times 18th August 2021

৮। Times Of India 14th August 2021

৯। The Guardian 17th April 2018

১০। Internet Source: Wikipedia

**(প্রদর্শিকা পত্রিকা থেকে নেওয়া)**

# লকডাউনে শিক্ষার হাল

নীলকণ্ঠ

২০১৯ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে করোনা ভাইরাস আবিষ্কৃত হবার পর তা মহামারি আকারে দ্রুত গতিতে বিশ্বব্যাপী ছড়াতে থাকে। ভারতবর্ষে জানুয়ারি, ২০২০ তে প্রথম করোনা ধরা পড়ে কেরালায়। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসের মধ্যে তা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ২৫ মার্চ, ২০২০ থেকে ভারত সরকার সারা দেশে লকডাউন ঘোষণা করে। সাধারণ জীবনযাপন ব্যাহত হয়। অন্যান্য সব কিছুর সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শুরু হয় বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থার খোঁজ। বিশ্বব্যাপী শিক্ষাদান প্রণালী পড়ে চ্যালেঞ্জের মুখে।

## লকডাউনে গৃহীত পন্থা

আমাদের রাজ্যে দেশব্যাপী লকডাউন ঘোষণার পূর্বেই ১৬ মার্চ, ২০২০ রাজ্য সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের নির্দেশ দেয়। তা আজ অব্দি বজায় আছে। প্রাথমিক পর্যায়ে কিছুদিন পঠনপাঠন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকলেও রাজ্য সরকার একটি টিভি চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ৭ এপ্রিল, ২০২০ থেকে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির জন্য লাইভ ক্লাসের ব্যবস্থা করে। পরবর্তীতে তা নবম ও একাদশ শ্রেণির জন্যও শুরু হয়। অন্য একটি টিভি চ্যানেলে 'বাংলার শিক্ষা জুনিয়র ক্লাস' নামে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির লাইভ ক্লাসের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যা জুন, ২০২০ পর্যন্ত চলে।

শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার মধ্যে রাখতে 'বাংলার শিক্ষা' ওয়েব পোর্টালে প্রশ্ন সম্বলিত অ্যাক্টিভিটি টাস্ক প্রথম থেকে দশম শ্রেণির জন্য ২০২০ সালে তিন দফায় ও ২০২১ সালে জুলাই মাস থেকে প্রতিমাসে প্রদান করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে সেগুলি ছাত্র ছাত্রীদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়।

অফিসিয়ালি কোনো নির্দেশিকা না থাকলেও বেশ কিছু বিদ্যালয় ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশুনোর কথা বিবেচনা করে নিজ উদ্যোগে অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও হোয়াটস অ্যাপ, গুগল মিট, জুম প্রভৃতির মাধ্যমে অনলাইন ক্লাস নেয়। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও শিক্ষকরা একই পন্থা অবলম্বন করে। পঠনপাঠনের মত মূল্যায়ন প্রক্রিয়াও অনলাইনে নেওয়া হয়।

ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যেও একই ছবি দেখতে পাওয়া যায়। কেরালা সরকার নিজস্ব Victers টিভি চ্যানেলে 'ফার্স্ট বেল' নামে ক্লাসের ব্যবস্থা করে। মহারাষ্ট্র সরকার টিভি চ্যানেল, রেডিওর পাশাপাশি DIKSHA নামক অ্যাপের মাধ্যমে শিক্ষাদান ব্যবস্থা করে।

## শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব

লকডাউনের কারণে শিক্ষাব্যবস্থার উপর ঋণাত্মক প্রভাব পড়েছে তা সন্দেহাতীত। সরাসরি ক্লাসরুমে স্বাভাবিক শিক্ষাদান ব্যহত হওয়ায় একটা বড়ো অংশের শিক্ষার্থী বঞ্চিত হয়েছে। শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ এ ১৪ বছরের নিচের শিশুদের বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা ও শিক্ষায় সমতার ধারণা সম্পূর্ণ ব্যাহত হয়েছে। UNESCO এর একটি সমীক্ষা অনুসারে ভারতবর্ষে প্রায় ৩২ কোটি শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই লকডাউনে। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'লকড আউট: এমার্জেন্সি রিপোর্ট অন স্কুল এডুকেশন' নামে একটি সমীক্ষায় খুবই হতাশাজনক চিত্র প্রকাশিত করেছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে ৪৮ শতাংশ ছেলেমেয়ে কয়েকটি শব্দ ছাড়া কিছুই পড়তে পারছে না। অক্ষরজ্ঞান থাকলেও চর্চার অভাবে প্রায় ভুলে গেছে। গ্রামীন এলাকায় ৩৭ শতাংশ ছেলেমেয়ে পড়াশুনোর কোনো সুযোগই পায় নি। শহরে তা ১৯ শতাংশ।

লকডাউনে প্রান্তিক অংশের পরিবারগুলোতে আর্থিক সংকটের কারণে শিশুশ্রমের হার বেড়েছে। RTE Forum ও Campaign Against Child Labour (CACL) এর যৌথ সমীক্ষায় প্রকাশিত শিশুশ্রমের হার বেড়েছে পূর্বের তুলনায় ৯০ শতাংশ। যা খুবই ভয়াবহ। বিশেষজ্ঞদের মত অনুসারে লকডাউন পরবর্তীতে বিদ্যালয় খুললে Drop Out এর হারও বাড়বে পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণ।

শিশুশ্রমের পাশাপাশি লকডাউনে বাল্যবিবাহও বেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ২০২০ সালের লকডাউনের প্রথম দিকে ৪২ টি বাল্যবিবাহের রিপোর্ট জমা পড়ে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিদ প্রফেসর অমিতা রামপাল বলেন প্রায় ২০ শতাংশ মেয়ে বাল্যবিবাহের কারণে লকডাউন পরবর্তীতে আর বিদ্যালয়ে ফিরবেনা, যাদের বেশিরভাগই পরিযায়ী শ্রমিকদের

পরিবারের।

অনলাইন এডুকেশনের জন্য প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের শিশুদের হাতে মোবাইল তুলে দেওয়াতে মানসিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। শিক্ষা বহির্ভূত বিষয় যেমন- মোবাইল গেম, ভিডিও গেম প্রভৃতিতে আসক্ত হয়ে পড়ছে। আর্থিক সংকটপূর্ণ পরিবারগুলোতে অনলাইন এডুকেশনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অপ্রতুলতার জন্য আত্মহত্যার মত দূর্ঘটনাও লক্ষ্য করা গেছে। Indian Journal of Psychological Medicine এ প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে লকডাউন পর্বে ১০-১৮ বছরের শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার হার বেড়েছে ৯.৩–৩৩ শতাংশ।

কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের অনলাইন এডুকেশন ও মূল্যায়নের ফলে কার্যকর শিক্ষা অর্জনের প্রবণতা কমছে। কমছে মূল্যবোধ। বাড়ছে যোগ্যতাহীন ডিগ্রিধারী যুবক যুবতীর সংখ্যা।

২০২০, ২০২১ সালে মূল্যায়নহীনতায় মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এমনকি কলেজের ক্ষেত্রেও পাশের হার প্রায় ১০০ শতাংশ। ফলে পরবর্তী উচ্চপাঠ গ্রহণে তৈরি হচ্ছে সংকট। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাড়ছে বিশৃঙ্খলা। বাড়ছে হতাশা, মানসিক সমস্যা।

## বিকল্প পন্থার বাস্তব চিত্র

লকডাউনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সরাসরি ক্লাসরুম শিক্ষাদান পদ্ধতির বিকল্প হিসেবে অনলাইন এডুকেশনের উপরই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। লকডাউন পরিস্থিতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (UGC) ২৫ মার্চ, ২০২১ একটি সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে, যাতে বলা হয় লকডাউন পরবর্তীতেও কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসের ৪০ শতাংশ অনলাইন মাধ্যমে পাঠ দিতে হবে। শুধু কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও অনলাইন এডুকেশন ভারতবর্ষের মত দেশে কতটা যুক্তিগ্রাহ্য একটু দেখা যাক:-

Niti Aayog এর 'Strategy to New India' রিপোর্ট অনুসারে ৫৫০০০ গ্রামে কোনো মোবাইল নেটওয়ার্ক নেই। ২০১৯ এর একটি সরকারি সার্ভেতে দেখা যায় মাত্র ২৪ শতাংশ পরিবার ইন্টারনেট ব্যবহার করে। RTE Forum ও CACL যৌথ সমীক্ষা অনুযায়ী লকডাউন পর্বে মাত্র ২৯ শতাংশ শিক্ষার্থী (দ্বাদশ পর্যন্ত) অনলাইন শিক্ষার সুযোগ লাভ করেছে। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে যা মাত্র ২১.৫ শতাংশ। Telecom Regulatory Authority of India-র তথ্য অনুসারে ভারতে ১৩০ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ৭৮ শতাংশের মোবাইল ফোন আছে, যা গ্রামীন এলাকার ক্ষেত্রে মাত্র ৫৭ শতাংশ। উচ্চ ক্লাসের ৬৮ শতাংশ শিক্ষার্থীর কাছে স্মার্টফোন আছে। সুতরাং একটা বড়ো অংশ অনলাইন এডুকেশনের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে না।

লকডাউনকালীন ভারতের জনসংখ্যার একটা বিশাল অংশ দারিদ্র্য রেখার নিচে চলে গেছে। Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) এর রিপোর্ট অনুসারে ২০২০-২১ বর্ষে ১৫–১৯ লক্ষ মানুষ দারিদ্র্য রেখার নিচে নেমে গেছে। এর অর্থ সামগ্রিকভাবে ১৫–২০ শতাংশ দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৃহৎ অংশের মানুষের কাছে অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করা অসম্ভব। ফলস্বরূপ তৈরি হবে শিক্ষায় বৈষম্য।

অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থার একটি মূল অংশ হলো শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ। UDISE 2019-20 এর তথ্য অনুসারে ভারতে প্রতি ৪ জনে ১ জন শিক্ষকের অনলাইন শিক্ষকতার প্রশিক্ষণ আছে। সরকারিভাবে মাত্র ১৫ শতাংশ শিক্ষককে অনলাইন শিক্ষণের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ভারতবর্ষে বিকল্প শিক্ষাপ্রণালী হিসেবে অনলাইন এডুকেশনের বাস্তবায়ন অনেক কঠিন ও যুক্তিহীন।

## শেষের কথা

নিঃসন্দেহে লকডাউন শিক্ষাব্যবস্থার স্বাভাবিক অগ্রগতিকে ভেঙে দিয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে শ্রেণি বিভাজন। বেড়েছে বঞ্চনা, বৈষম্য। এই বৈষম্য দূরীকরণে প্রশাসনকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। লকডাউনে শিক্ষাব্যবস্থার বিকল্প পথ নিয়ে ভাবতে হয়েছে। ভবিষ্যতে শিক্ষা, শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষার মান বজায় রাখার জন্য দায়িত্বশীল মহলকে সচেতন হতে হবে।

'প্রশাসন', 'দায়িত্বশীল মহল' ব্যাপারগুলি রক্ষণকামী ক্ষমতাচক্রের খপ্পরে কি আদৌও সম্ভব? সম্ভব নয়। রক্ষণকামী ক্ষমতা জোড়াতালি দিয়ে হাভডা বাভডা করে শিক্ষাব্যবস্থাকে সচল রাখার ভান করেছে। পরিণামে শিক্ষাসহ যাবতীয় নাগরিক পরিষেবা স্বাভাবিকতা হারিয়েছে। রক্ষণকামী শাসক শ্রেণির থেকে আর্থসমাজকে মুক্ত না করলে নাগরিকদের শিক্ষাসহ সকল কিছুতেই ভুগতে হবে। সে আকাল হোক কিংবা অনাকাল হোক। বস্তুভিত্তিক চিন্তা পদ্ধতি আয়ত্ত করতে পারলেই রক্ষের কাছে এর জবাব চাওয়া যায়।

গল্প

# দখল

**কস্তুরী**

কই গো বিশু কোথায়? ঘুম ভাঙেনি নাকি? নাপিত পাড়ায় যেতে হবে। শীতের সকাল, চারিদিক কুয়াশায় ঢাকা, মোড়ের চায়ের দোকানে সবে আঁচ দিয়েছে। কেটলিটা উনুনে তখনও বসে নি। পুকুরের জলে সর পড়ে আছে। হরেন হন্তদন্ত হয়ে হাঁক পাড়ে। বিশ্বজিৎ বাবুর বৈঠকখানায় তখন দুজন মহিলা ও তিনজন মাঝারি বয়সের পুরুষ চুপচাপ বসে অপেক্ষা করছে। বিশ্বজিৎ বাবুর বৈঠকখানায় দুখানা ঠেস বেঞ্চ থাকে বসবার জন্য। বিভিন্ন প্রয়োজনে গ্রামের মানুষ বিশ্বজিৎ বাবুকে ভরসা করেন। হরেন খুব চঞ্চল মানুষ, সে বাইরে না বসে বাড়ির ভেতরে উপস্থিত। আরে বিশু করছ কি, দেরি হয়ে যাচ্ছে। আজকে নাপিত পাড়ার সালিশ এর কথা তোমার মনে নাই?

বিশ্বজিৎ— কাকা আমার কি সংসারের কোনো কাজ নাই। কালকে হরিপদকে নিয়ে ফিরেছি রাত এগারোটায়। বাপকে এক মাস ভাত দেওয়ার কথা, কিন্তু একমাস তিন দিন হয়ে গেছে গুরপদর। হরিপদর স্ত্রী অসুস্থ বলে বাপকে ভাত দিতে ডাকতে পারেনি। এই নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে মারামারি।

হরেন— তুমি আর দেরি কোরো না বিশু, মোড়ে চা খাবে, চল।

বিশ্বজিৎ— বাইরে কতকগুলো মানুষ বসে আছে ওদের সাথে কথা বলে যাচ্ছি। আঙিনা ঝাঁট দিচ্ছিল সরলা — মুখ ঝামটা দিয়ে বলল ওই করেই বেড়াও, বাড়ির কোনো কাজ কর্ম নাই, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনো কিছু দেখাশুনো নাই সব দায় আমার। নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।

বিশ্বজিৎ— আহা সরলা সকাল সকাল গজগজ কোরো নাতো। মানুষ বিপদে পড়ে বলেই তো আসে আমার কাছে।

নাপিত পাড়ায় প্রাইমারি স্কুলের বারান্দায় সভা বসেছে। আছেন পঞ্চায়েত প্রধান, পাড়ার হোমড়াচোমড়া, মাস্তান, গোছের ছেলেরা। যারা প্রতিনিয়ত প্রধানকে গার্ড দেয়। নব্বইয়ের দশকে শাসক দলের যে চরিত্র ছিল তারই দৃষ্টান্ত। এদিকে বিশ্বজিৎ কিছু অনুগামীদের নিয়ে উপস্থিত।

গগনের বাপ একাই। গগনও একাই। তার আর কোনো ভাই বোন ছিল না। এক বিঘা জমি সে পেয়েছিল উত্তরাধিকার সূত্রে। এক কোণে দু-খানা চালা ঘর করে বাস করত। বাকি জমি পড়েই থাকতো। গগন ছিল ঘরামি, সারা দিন থাকতে হত কাজের জন্য বাড়ির বাইরে। যেমন নিরীহ তেমনি সৎ মানুষ কারো সাতেপাঁচে থাকতো না। গগনের বৌটা ছিল একটু মুখড়া। গগনের প্রতিবেশী শ্রীধর ছিল পার্টির লোকাল কমিটির সেক্রেটারি। ক্ষমতার বলে শ্রীধররা যা নয় তাই করত। শ্রীধর হায়েনার মত ওঁত পেতেছিল গগনের জমিটা জবরদখল করার জন্য। একদিন জনা পঞ্চাশেক মাস্তান গুণ্ডা নিয়ে গগনের বাড়ির সামনের ফাঁকা জায়গাটা চাটাই-এর বেড়া দিয়ে জোর জবরদখল করে নেয়। বাধা দেওয়ার বা আটকানোর গগনের কেউ ছিল না। অগত্যা বিশ্বজিৎ-এর কাছে যাওয়া গগনের বৌ এর। আমার কেউ নেই বলে সব জোর করে কেড়ে নেবে দাদা— বলে হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে।

বিশ্বজিৎ— আমি সব শুনেছি। তুমি গগনকে নিয়ে থানায় যাও আমি আসছি।

গগনের বৌ— দাদা থানায় গিয়ে কিছু হবে না। ওদের থানা, দারোগা পুলিশ ক্ষমতা সব ওদের।

বিশ্বজিৎ— আইন বলে এখনো কিছু আছে, তুমি যাও।

গগনের বৌ— ঠিক আছে দাদা আমি গেলাম।

থানায় ডায়েরি করা হল। থানার বড় বাবু কোর্টে যেতে বললেন অর্থাৎ বিস্তর হ্যাপা।

বিশ্বজিৎ, হরেন মল্লিক, যদু বাবু, নন্দ ঘোষ, পাঁচকড়ি এদেরকে নিয়ে গিয়ে পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে দেখা করলেন এবং প্রস্তাব রাখলেন গ্রামেই সমস্যার মিটমাট করবার। প্রধান বললেন শুনেছি তো শ্রীধরের বাবার জায়গাটা, ওতো ঠিকই করেছে।

বিশ্বজিৎ— আপনি ভালো করেই জানেন জায়গাটা গগনের। বাজে কথা রাখুন সালিশি সভার আয়োজন করুন। যেমন করেই হোক গগনের প্রাপ্যটা বুঝিয়ে ফিরিয়ে দিতে হবে। একরকম বাধ্য হয়েই প্রধান সালিশ ডেকেছে। সালিশে শ্রীধরের ঔদ্ধত্য, আস্ফালন, নকল দলিল, মিথ্যা কথা উপস্থিত সকল মানুষ লক্ষ্য করলো। শ্রীধরের পক্ষেই প্রধান বক্তব্য রাখলেন।

মাস্তান গোছের ছেলেরা হৈ হৈ করে উঠছে। সমস্ত পরিস্থিতি গগনের ভয়ের উদ্রেক করে। বিশ্বজিৎ গগনের ঘাড়ে হাত রাখে অভয় দেওয়ার জন্য। বিশ্বজিৎ-এর অকাট্য যুক্তি, দলিল, দাগ নং, খতিয়ান নং, রেকর্ড প্রমাণ করে দেয় যে জমিটি গগনের।

দিন কয়েক পরে দেখা যায় যে হরেন ছিল বিশ্বজিৎ-এর বিশ্বস্ত লোক তাকে শ্রীধরের সাথে ঘুরতে। বিশ্বজিৎ আশঙ্কা করে। অনুমান করে হরেনকে ভয় দেখিয়ে দলে নিয়েছে। প্রতাপ, ক্ষমতা আধিপত্যকামিতার ব্যর্থতা তারা মেনে নিতে পারে নি। গ্রামে থমথমে আবহাওয়া, পাড়ায় পাড়ায়, দোকানে দোকানে ছোট ছোট মিটিং গোল টেবিল।

কাক ডাকা ভোরে চারিদিক শুনশান, চৌরাস্তার ধারে ঘাসের উপর পড়ে একটি ছিন্নভিন্ন দেহ। পাশের ঝুপড়ি থেকে পাছা ঘসে ঘসে বুড়ি বেরিয়ে আসে। দূরে শেয়াল ডেকে ওঠে। বুড়ি এগিয়ে এসে বিশ্বজিৎ-এর বুকের উপর হাত রাখে কিছু একটা অনুভব করার চেষ্টা করে কিছুক্ষণ। তারপর হাত সরিয়ে নিয়ে বলে, আবার ঘুরে আসিস বিশু।

Space Donated By A Well Wisher

গুচ্ছ কবিতা

রঞ্জন পাড়ুই

## ক্লিশে চাল!

চল চমকাই!
ভালবাসতে শিখিনি
গেয়েছি শতফুল বিকশিত হোক,
অনেককাল জুড়ে তবু...
কেবলই মগজের কারবার সব!
হৃদয় কোথায় ফেলেছিনু জানি না, আজও
একদিন তোমায় প্রশ্ন করলাম,
আচ্ছা বলতো, এত ট্যাকটিস-কৌশল
এটা-ওটা-সেটা, একে দিয়ে তাকে,
তাকে দিয়ে একে বেডরুম-পার্টি অফিস একাকার!
কী ছিঁড়েছিলে? কোন ঘাস?...
দূর্বা?... নাকি শ্যামা কিম্বা অন্যকিছু...
অথচ মিথ্যা-কিছু স্লোগান-মোহে
আজও থ্রিল, রোম্যান্টিক বিপ্লবীয়ানায়!
একে কী বলে, বাঙালি ভাবালুতা?...
না ভাই, ভুল কোরো না
স্রেফ সামাজিক আধিপত্যের পেরেক পোঁতা!

অনুভূতি শূন্য ফাঁকা মরু-মস্তিষ্কের রক্তবীজ
ঝাড়ে-বংশে শেষ হয়না কখনো,
কোরায়েশ আবু সুফিয়ান ফিরে আসে,
মোয়াবিয়ার খাঁটি মুসল্লির সাজে!
তবু, তার পরিণাম তো এটাই,
সে ধরা পড়ে যায়
অস্তিত্ব-এর পাতা ফাঁদে!
তারপর গ্রীষ্মের এক রুখা দুপুরে
খেজুর-ফাঁদ অপেক্ষা করে তার জন্য!
এই?
হ্যাঁ, ততদিন সে জ্বালাতন করে
করেই যায়, মানবতার সাথে লাগালাগি
তার কলা-কোষ-মজ্জায় খেলা করে!
(সেপ্টেম্বর, ২০২১)

## ইডিয়ট

ডানে বাঁয়ে সামনে পেছনে জঞ্জালের স্তূপ
বানিয়ে রেখেছি কতকাল!
ভদ্র ছিলুম, সভ্য বড়!
জঞ্জালের কিনারা ধরে সরু গলি বেয়ে
কিছু লোক অনেক কালজুড়ে উচ্ছন্নে গিয়েছে...
আমরাই ওদের পাঠিয়েছি সেইখানে
ইনফার্নোতে বেড়া ওঠা ঘৃণ্য কীটাণু কীট...

আমাদেরই যৌন অবদমন বিবিমিশা হয়ে
সেইসব কীট এনে ভরে দেয় সংসার চরাচর!
হঠাৎ কাল বেয়ে একদিন
পলিটির শীর্ষে ধেয়ে আসে লুম্পেনী শত-দল
হীন সে যে বড্ড ছোট,
নীচে টানে এক হ্যাঁচকা
ইডিয়ট বনে যাই, আচমকা! (সেপ্টেম্বর, ২০২১)

## শূন্য কলস

নয়া ইস্তাহার বিলি চলে কাগজে কাগজে
বুড়ো-হাবড়া বাদ! এইবার সেয়ানে সেয়ান
লড়াই জব্বর!
তরুণ-যুবা তাজা লহু, বীর বাহু
আহা! বুড়োরা যাবে বনবাস!
জোর মহড়া! পার্টি ক্লাস! এই তো আহা,
যেন এসে গেল বিপ্লব!
মোড়ের মাথায় হঠাৎ শুনি পাঠচক্র!
মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, ওয়াও!
মার্কস মুচকি হেসে বললেন, ওহে বাপু পাঠ-চক্র বুঝলাম!
কীসের পাঠ? আগের কথাগুলিই তো?
সেই যে...
খেটে খাওয়া গরিব মেহনতি
জনগণতান্ত্রিক রিলিফ
সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক
পুঁজিবাদ দূর হটো!
আর 'চোখের মণির মত' কাকে যেন বাঁচিয়ে রাখার কথা!
এই?...
তবে কলসি তো ফাঁকা!
জনশ্রুতি, ফাঁকা কলসির আওয়াজ বেশি!
কলসি ভরার কথা
সমকাল সংকটের, সমকাল ভাষ্যে...
সামনে অস্তিত্বঃ পেছনে তাকিয়ে কী খোঁজ হে!
অস্তিত্বহীন কলসি গণ-জন-রণ সমাহার থেকে দূর ব্যবধিত! (অগাষ্ট, ২০২১)

## লাশের উপর 'নাচ'

বিশাল-বিরাট প্রচন্ড লড়াই
লড়াকু জওয়ান সব দাঁড়িয়ে ঠাঁই
বিনা যুদ্ধে নাহি দেবে সূচগ্রমেদিনী!

কোথায় প্রতিপক্ষ, তোরা আয়!
ধেয়ে আসে লুঙ্গি গেঞ্জি লাঠিধারী শীর্ণ এক চাষি!
অত্যাধুনিক অস্ত্র ঝলসায়, নিথর দেহ লুটিয়ে পড়ে ;
বীর সেনানী লাঠি হাতে ছোটে, লাশ পেটায় কিছুক্ষণ ;
ক্যামেরা সঙ্গী ছিল একজন
ঘৃণা তার বাধ না মানে, ছুটে যায়, মারে জাম্প
ডান্স মারে লাশের উপর, মারে ঘাই!
তার জাম্পে যেন গণতন্ত্র ডান্স মেরে উঠে যায়
ভাষা-ধর্ম মাইনোরিটির বুকে!

সভ্যতা-ভব্যতা-বিধান কোথা যায়?
স্থবির মাংসপিণ্ড আমাদের ওই লাশটির মতই,
কথা কয় না, পড়ে রয় নিথর
দেশ-জনপদে এভাবেই ঠান্ডা শীতল সর্পিলতা
ধীরে সন্তর্পণে গুড়ি মেরে এগোয়!

বেনিয়ার নৃশংসতা ঢেকে দিতে চাও
দেশি-বিদেশির গল্প ফেঁদে
কুবেরকে লুকাতে চাও
কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের হাড়-হিম শীতল স্রোতে ;
তোমায় সেই গল্পটি মনে করিয়ে দিতে চাই
আতঙ্কের হাড়-হিম শক্ত নেতা
তার ভয়ে থরহরি জনতা
একদিন ভয় কেটে যায়—
জনতার আদালতে রায় :
নৃশংস জল্লাদ ল্যাম্পপোস্টে উল্টো লটকায়!
সেই লাশের উপর চিল-শকুনের নাচ
ইতিহাসের মহাফেজখানায় রেকর্ডেড আতস কাচ!
দেখে নাও!— এই তোমার আগামী ভবিষ্যৎ!
(সেপ্টেম্বর, ২০২১)

## নামাবলী

মার্কসও গুরু হয়, তারও নামাবলী হয়
তার সূত্রায়নের সাইন বোর্ডও হয়
বোর্ড ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে কতকাল মন্ত্রপাঠ
ধীরে ধীরে নাম মাহাত্ম্য উধাও করেছি ;

ছদ্মবেশে লোক-নেতা আর ব্যুরোক্র্যাট গুলিয়েছি
বোঝেনি কেউ
আমার পরে তুমি এসে ছদ্মবেশটা খুলে ফেলেই
বিপদ আনলে ডেকে, কমরেড!
ব্র্যান্ড দেখে যায় চেনা
ব্যাস! মাত্র কটা বছরেই খেল খতম
ব্র্যান্ডের ইমেজ জমি-জল কারখানা কৃষক
আরেক ছদ্মবেশি পেতেছিল ওঁৎ
বোঝোনিকো!
পপুলিজমের ছদ্মবেশ তখন-এখন

আচ্ছা চিন্তা কি হয় না? আমি তো পপুলিজমও নিইনি
এত্তোগুলি বছর! কেবলই ছদ্মবেশ
খেটে খাওয়া মেহেনতি
না, ভুল— শুধু তাই নয়
আজিজুল হকদের হাড়-মাস মজ্জাও ছিল
আর ছিল রাষ্ট্র-মেশিন: রুনু গুহনিয়োগীরা
নখ-দাঁত-বন্দুক হাড়-মাস-শিরদাঁড়া
যোনি-স্তন-রেকটাম বরবাদ
স্যাভেজ আতঙ্কের কারখানা!

এর সাথেই নামাবলী সাইনবোর্ড
আগামী ইতিহাস যদি বেইমান বলে,
মার্কসের ভূত যদি দেখা দেয় হঠাৎ
কান ধরে উঠিয়ে বলে— জবাব দে ব্ল্যাকমেইলারউ!
বলুক ক্ষতি কী
জীবন ঝরিয়া গেছে আমাদের কুড়ি কুড়ি বছরের পর
ভোগ সুখে— চিতাতেই সব শেষ!
(সেপ্টেম্বর, ২০২১)

## নতুন কথা

তুমি ট্র্যাক ভাঙলেই বিরক্ত হও
চেনা-ডিকশনারির চেনা শব্দ চেনা যতি চিহ্নের বিরাম;
চেনা-রাস্তার চেনা মোড়, গলি পসরা
চেনা দোকানদার!
চেনা গৃহকোণ ছেড়ে অচেনা বন্দরে
বড্ড বিরাগ তোমার!
এর কারণ কি তুমি জান?
করেছ কি অনুভব, অভাব কিছুর?
ভেবেছো কি?
ভাবতে জানলে হয়েই যেত
জটিল অঙ্ক সমাধান!
আসলে বেঁচে নেই তুমি!
খাপ-বদ্ধতায় নতুন পথ নতুন নদি বন্দর
শব্দ অর্থ চরাচর!
নয়া ডিকশনারি!....
মিনিংলেস মনে করেছো কতকাল!
আর তাতেই বীরসিংহের শিশু

কিম্বা রোমক ভূমিদাসের যিশু
বা মরুর বুকের ওয়েসিস-আল আমিন
কিম্বা রামমোহনী মহীন...
তোমারই রাষ্ট্র-সামাজিক ব্যরিকেডে আগুন জ্বালায়,
তাতেই খড়্গ নামিয়ে আনো সে যুগ-প্রজ্ঞার গলায়;
তবু যুগান্তরের নির্ধারক সন্নিকট দেয় গড়ে
ভেদ, ঝাড়ে-বংশে বিনাশ করে রক্তবীজ-ভাগাড়!
তারপর, সে এক অন্যদিন, অন্যরকম দিন
তুমি তাকে তকমা দিতেই পার নতুন সেদিন!
হৃদয়ের অদৃশ্য-প্রকোষ্ঠে খেলা করে!

(সেপ্টেম্বর, ২০২১)

## গতর-পুষি দিন

দামি ব্রান্ড খাদ্য বা ভোগ্যপণ্যের ডাঁই
তুমি চাও সে চায় আমিও চাই
গামছা গায়ে লোকটিও
কারখানা বা মাঠের লোক প্রভেদ নাই
চাম-চিকন আদি-প্রেমও সব্বার চায়
আজকাল ধরনে আমেরিকান তাও!

কালচারও চিকন
কথা শুধু কথার ফানুস, শ্রম-মূল্য হিসেব বিহীন;
অনুষ্ঠান শেষে বাসমতি সুবাস
কিম্বা পদ্মা-ইলিস খিচুড়ি সহযোগ, সাবাশ!

এইভাবেই গতর-পুষি দিন যায়
কলা কোষ বৃদ্ধি পেতে পেতে একবার
আর বাড়ে না, ক্ষয় হয়...
জ্বরা দেহের মৃত্যু...
আগেই কি বেঁচে ছিলাম ছাই?
শ্যেন প্রশ্নে জেগে দেখি মৃত মানুষের মরণ
কারুর কিছু আসে যায় না, হয় না স্মরণ!
গতর-পুষি কত শত লক্ষকোটি
হিসেব বিহীন কেবল কঙ্কাল-করোটি!
সে হরপ্পা থেকে মিশর বা ব্যাবিলন
মায়া বা ইনকা করুন প্রক্ষালন!

গতর-পুষি নয় এমন মানুষ খুঁজতে গিয়ে
লালন সাঁইকে প্যারালাল সোসাইটি গড়তে হয়েছিল;
লেনিনকে ১৯ বছর ছদ্মবেশে-বেশে পালাতে হয়েছিল;
মুজাফফর আহম্মেদ বিয়ে করতে ভুলে গেছিলেন;

স্বতঃসিদ্ধে জার্মান ঋষি(মার্কস) জানালেন,
মায়াকোভস্কির ভালবাসার নতুন দিন
গতর-পুষিতা বিনাশের মধ্যেই আনা যায়!!

(অগাষ্ট, ২০২১)

## বর্বর আসে ঐ

স্বঘোষিত ঠিকাদার লেজ গুটালে
প্রাগৌতিহাসিক বর্বর এগিয়ে আসে সগৌরবে!
প্রথার কড়া আফিম প্লাস অ্যানিম্যালিটি
ধ্বস্ত মানবতা, কোথায় র‍্যাশনালিটি?

মনে হয় মানুষের কাহিনিতে কেবল
ছড়াছড়ি করে অ্যানিম্যাল অ্যাপেটাইট!
জমি চায়, দখল করো
সমুদ্র চায়, দখল করো
আকাশ চায়, দখল করো
দাস চায়, দখল করো
নারী চায়, দখল করো!
সব দখলই শেষ অব্দি নারী অনাচারে গিয়ে ঠেকে!
তাকে ঘেরো-বাঁধো-মারো-কাটো
আরো কত কী!

অন্ধকারের যে মোচ্ছবে নিমজ্জিত
মধ্যপ্রাচীয় সপ্তম শতক, পেয়েছিল ত্রাণ...
যে হাত-হৃদয়-মস্তিষ্ক শুনেছিল
গুমরে উঠা মানবতার কান্না-ঘ্রাণ
তারই নামে বর্বর-স্যাভেজারি
বন্দুক নিয়ে উঠে আসে!

জাহেলিয়ানার বর্বর-স্যাভেজারি ঝাড়েবংশে শেষ
হয়েও শেষ হল না কেন?
সেই জাহেলদেরই জাহেলিয়ানার আবৃত্তি
আর শিশু-নারীঘাতী কৃমিকীট!

মরুর বুকে প্রতিকারী ঝড়ের নিম্নচাপ
কবে কখন আর কতকাল পর! (অগাষ্ট, ২০২১)

## আড়ি-চাচা

তুমি ঘরে ঘরে সিঁদকাঠি লাগিয়েছ, কবেই
গোপন যন্ত্র-কান লাগিয়েছো দেয়ালে দেয়াল
কেউ জানে না।
হঠাৎ হাটে ভাঙল হাঁড়ি !
মুখ খুললেই কী জানি ছাই কী বেফাঁস বলি
ভেবে স্পিকটি নট, তুমি

বিরোধী দল, জার্নালিস্ট এমনকি বিদেশ
ছি ছি করে!
করুক, কদিন করবে?

নীতি নৈতিকতা? ফুঃ আমি বানাই ওসব!
আমিই নীতি, নীতিই আমি— সর্বশক্তিমান
মনে রেখ, বেয়াক্কেল দেশ-বিরোধী
ট্রেটর যত সব!
ক'টা দিন যাক না, হিসেব ষোলো আনা
বুঝিয়ে দেব, জেল ও জরিমানা!
কোভিড ডেথ হয়তো কারুর ললাট লিখন
সাবধান হও
মনে রেখ, অষ্টাদশী এক মেয়েও
পারেনি পালাতে এ নৃশংস রাডার আমার!
তোমরা তো সেয়ান, কী করে কোন অঙ্কে ছাড়া পাও?
কোনো ছাড় নেই!

কৃষক সেজে বসে থাকা মাওয়ালি সর্দার
তুমি করো ষড়যন্ত্র!
আমি প্রোটেকশন নিলে অপরাধ
গণতন্ত্র গণতন্ত্র চেঁচাও!
যত জোর গলা পার করো
এই হবে আজ ভূ-ভারতে নতুন নিয়ম জেনো
নিউ ইন্ডিয়া, ট্রা-লা-লা!

জ্ঞানের দেশে সূর্য নিভে গেছে কতকাল
কিষ্কিন্ধ্যা আবৃত জনপদ!
বেশি নিশ্চিত হ'য়োনাকো তবু,
অযোধ্যার কিষ্কিন্ধ্যা ভেদ করেই ঘটে যায়
রাম অভিষেক!
রামায়ণ— আর্থসামাজিক পবিত্রায়ন তা
নয় প্রথা, নয় আচার
নয় পূজা পাওয়ার নতুন কোনো ভেলকি তোমার...
চুপি চুপি বাল্মীকি বার্তা ছড়ান
জনপদ থেকে জনপদ!
মনে করে দেখ একবার...
শত হাজার গুপ্ত-চরেও
মোজেস-জন্ম ঠ্যাকাতে পেরেছিল ফ্যারাও?

(জুলাই, ২০২১)

## সে বিদ্যালয়ে প্রশ্ন নেই

তোমার 'বিদ্যালয়' বিদ্যার কি অবিদ্যার
তোমার বিদ্যালয়ের ছাঁচ
তোমার অধিকৃত শিক্ষা না কি অশিক্ষার প্যাঁচ
একক দশক শতক করে দেখে জনপদ
বিদ্যার নামে অবিদ্যার কিষ্কিন্ধ্যা ঘোর
ঘিরেছো কতকাল, ঠেলেছো প্রান্তে শ্বাপদ!
মডেল কতশত আসে আর যায়
কমিশনের পর কমিশন কিবা হয়
বড় কলেবর রিপোর্টে
তোমারই মুখ-রক্ষা হয়!
কচি মুখ বাড়ুক না বাড়ুক
পড়ুক ঝরে, যদি বাঁচে যেন তোমারই কথা কয়!

শাসনের যন্ত্র আর যন্ত্রের শাসনই কথার শেষ
যন্ত্রীও লাগে বাহারি নাম আইসিএস-আইপিএস-
আইএএস!
ব্রিটিশ বেহ্না থেকে গুজরাটি মাল্টিন্যাশনাল
তোমার বেহ্নাবাজির কল
জানি শিক্ষা তোমার যন্ত্রী যোগানের ছল!

তবু মনে রেখ
আইসিএসও গলার ফাঁস হয়
বিপজ্জনক মোস্ট ওয়ানটেড বয়
যন্ত্র বিকল ল্যাজে-গোবরে সেই 'নেতাজি'র ভয়!
ভাব, ভীত হও
ছাঁচ-ঢালাই বুলি পারে কি বাঁচাতে তোমায়
ইতিহাস কথা কয়!

(জুলাই, ২০২১)

## স্বাধীনতার ভোর

কোনো এক ভোরের নিশ্চয়ে
ভালবাসার সংগীত ঘোষণায় জেগে উঠে দেখি
চারদিকে সুস্বাস্থ্যের মেলা
মাঠে মাঠে পলাশ রাঙা রোদে
কৃষকের হাসি
নদির সোনালি জলে রূপোলি মাছের খেলা
জেলেদের হাঁকডাক প্রাণের সাড়া
শতাব্দী প্রাচীন যত বেড়াজাল
বিভক্ত তোমার আমার মাঝে— স্রেফ বাতিল
পাখির কাছে আকাশ যেমন
ভেদহীন তুমি আর আমি
বর্ণের গোল নেই ধর্মের জাল নেই
নতুন অন্তর্জালে মানবতার উৎসব প্রতিদিন

নিষাদ দোষাদ জারোয়া খাসি

বনে বনে আজ কেবল খুশি
অভিমান গেছে ঘুঁচে, শহর গ্রামে
নদি-পাহাড়ে, ঝগড়া নেই কোনো খানে ;

প্রতিষ্ঠিত শান্তি-নিকেতন দিকে দিকে
কচি-কাচা কোলাহল...
আর একজন... আবছা ভোরের আলোয় দেখা
শান্ত-সৌম রবি-ঋষি,
রাজর্ষি সে, পেতেছি ধ্বজা তার সবখানে!
জবর-দোস্ত শাসকের কশা কোথায় গেল!
উগ্র-লোলজিভ যত ব্রিটিশের মত
ছাঁটাই করেছি মিলিত দড়ির টানে!

গড়েছি তার পর এক সবুজ সেনাদল
ভালবাসার উপত্যকায় প্রেমের প্রহরা!

হঠাৎ জেগে দেখি আরে এ যে, স্বাধীনতার ভোর!
(অগাষ্ট, ২০২১)

## রক্ত-ঋণ

তুমি অশেষ বিরক্ত জানতাম হে, হুজুর
তোমার মান যাচ্ছে কতদিন
সাপের ছুচো গেলার দশা ;
না পার গিলতে, না পার ছাড়তে
হাভাতেগুলো দোরগোড়ায় আর কত দিন?
তোমারই সুপ্রিম কাজি অফিস ফোঁস করল
এই তো দুদিন হল: রাস্তা জ্যাম আর কতদিন!

তুমি বসে নেই
থাকতে পারবে না জানি
ইউপিতে আসছে কুরুক্ষেত্র, কী জানি কী হয়!
তোলো হঠাও এদের, খাট্টর কিছু করো
দিন বয়ে যায়!
মন্ত্রী-সান্ত্রি লোক লস্কর এই ক্ষণেই
'আর্মডগ্রুপ মোতায়েন স্ট্রাটেজি'-পার্ট কিনা
রুট-জার্নালিস্ট ঠিকই জানে;

শুরুর সে ব্যারিকেড জলকামান
পঞ্চমবাহিনীর লাগাতার আক্রমণ
কেস আদালত
কত কাণ্ড! দমেনি কৃষক
ওরা জান দেবে, মান দেবে না!
কাঁহাতক আর সহ্য হয়!

মার মার, ডোলে দাও
গুন্ডা লেলিয়ে দাও...
৪ টি প্রাণ নিথর হয়েছে...
মন্ত্রীর ছেলের গাড়ি লটবহর!

বলিউড হিরোর ছেলে ড্রাগ-কাণ্ডে গ্রেফতার
খবর বটে এক খান!
ঢাকো ঢাকো, কৃষকের খবর ঢাকো!

ওরে মূর্খ ভুলে যাস কেন,
শাক দিয়ে কি মাছ ঢাকা যায়!
গন্ধ লাগে!
গন্ধ লেগেছিল চাষার নাকে আগে
আজ এগন্ধ সব নাকেই ধেয়ে আসে
রেডি হ, দেরি নেই আর!

তবু বড্ড অধীর লাগে...
ইতিহাস দেখেছে এমন যুগ
রক্তের বদলে রক্ত, দাঁতের বদলে দাঁত
চোখের বদলে চোখ
র‍্যাশনালিটি ছিলনা, তুমিও অ্যানিম্যাল
আর তোমার জবাব ছিল
অ্যানিম্যাল কম্যান্ডমেন্ট!
মনে পড়ে মোজেসের কথা!
আজ তাকেই যে বড় দরকার!
আমি তার আদেশে র‍্যাশনালিটি ছেড়ে দিতে রাজি;
রক্ত-ঋণ যদি শোধ হয়!!
(অক্টোবর, ২০২১)

# পড়া

## শ্রীচেতনিক

তুমি পড়তে বলছ, মহাভাষ্য!
তা এখন তোমারই ঢাল!
তুমি পড়তে বলছ বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ মহাভারত-বাদ!
তার খোল-নলচে কতকাল আগেই করেছ বরবাদ!
তুমি পড়তে বলছ বুদ্ধ, তার থিয়োরি-সহ ফিগার
করেছো জব্দ, দশম অবতার!
তুমি পড়তে বলছ টেস্টামেন্ট নিউ বা ওল্ড
কবেই করেছো তার ফর্দাফাই সোল্ড!
তুমি পড়তে বলছ, মার্কস
বিংশের সত্তর থেকেই দিয়েছ বিনির্মান বিকর্ষণ
আর আর্থিক নিয়তিবাদের বাঁশ!
তুমি পড়তে বলছ, 'ইতিহাস'!
অতীত কাহিনির ফাঁস, সেই তোমার ইতিহাস!
সেখান থেকে নিতে বল তথ্য!
মনে নেই সাহিত্য সম্রাটী গাড্ডা, খাস!
ব্রিটিশ তথ্য-সাপ্লাই এ গড়লেন আনন্দমঠ!
শত্রু-মিত্র গোলানো মিকচার, বিষবৃক্ষ চাষ!

তার চেয়ে এসো, বরং বসি দুদন্ড
সংসার-হিসেব কষি শ্রম-মূল্য পরিমাপ তুলাদণ্ড!
'পড়তে বলা' পণ্ড-শ্রম হবে না জেন, নিশ্চিত
শ্রম-মূল্যের হিসেব কষা কষ্ঠিতেই যাচাই
জ্ঞান-অজ্ঞান, বিকৃতি-সুকৃতির জমানো-জট!
মহাভাষ্য কিম্বা জ্ঞান-ভাষ্যের অপরাপর সূত্র নির্দেশক!
তাতেই ফিল এণ্ড ওয়ার্ক, ওয়ার্ক এণ্ড ফিল; বিফল তো নয়!
কিম্বা লেনিনের রিড এণ্ড ওয়ার্ক, ওয়ার্ক এন্ড রিড!

(অক্টোবর, ২০২১)

# নন্দিতা

## আজিজুল হাকিম

নন্দিতা, তোমার স্বপ্নিল আহ্বানে আমি সাড়া না দিয়ে পারিনি।
অন্তহীন তকলিফকে সরিয়ে বাঁধভাঙা জলস্রোতের মতো
দূর্বার গতিতে ছুটে গেছি
তোমার রোদ-ছায়ার নান্দনিক বারান্দায় ;
তোমার লাল-নীল সোহাগের নেশায়।

নন্দিতা, তোমাকে কোল ভরা নুড়ি-পাথর নিয়ে খেলতে দেখেছি।
আত্মমগ্ন ক্রীড়া চঞ্চল বালিকার মতো সাজিয়েছ পাহাড়ি প্রাসাদ
ভীষণ স্পর্ধায় ছুঁতে চেয়েছ আকাশের নীল ;
পাহাড়ের শিখরে মুখ রেখে আলিঙ্গন করো,
চুম্বন করো মেঘেদের ধূম।
এক অব্যক্ত আবেগে ধুয়ে যায় তোমার পাহাড়ি-চূড়া বুক
উদ্বেলিত দমকা বাতাস ঢেউ খেলে যায়
তোমার সবুজ বসনা বুকে
সাঁ,সাঁ করে কী কথা যেন বলে যায় কানে কানে
সে কি অমর প্রেম, ভালোবাসার কথা!
আনন্দাশ্রু চুঁয়ে পড়ে নিঃশব্দে তোমার দেহ বেয়ে
হয়তো কোন এক সাগরের নেশায়।

নন্দিতা, তোমার অদৃশ্য উষ্ণ হাতছানিতে বিমোহিত হয়েছি বারবার;
তাই তো ভোরের বেলায় তোমার মাধবী রূপসী নেশায়
আকাশের নিমগ্নতা নিয়ে চেয়ে থেকেছি তোমার পানে
অনন্ত পিপাসা নিয়ে।
তোমার সৌন্দর্যের শিখর ছুঁবো বলে
ডনকুইজোটের মতো জীবনকে বাজি রেখে
সর্পিল গিরি-কন্দর, অসূর্যম্পশ্যা বনানী - পথ,
পিচ্ছিল পাথরের পর পাথর খণ্ডে
মৃত্যুর ছাড়পত্রকে চুম্বন করে গেছি
প্রতি পায়ের তলায় নিষ্পেষণ করেছি ক্লান্তির চিহ্ন।
একটু একটু করে ছুঁয়ে গেছি তোমার লাবণি পাপড়ি;
তোমাকে আবিষ্কারের নেশায়, বিজয়ের নেশায়
আমি তো কাপুরুষ হতে পারিনি, নন্দিতা।
যখন এক চিলতে সূর্যের ছটা
অযুত খণ্ড মেঘের ফাটল দিয়ে
তোমার পাহাড়ি চূড়া চুম্বন করে যায়,
তখন স্বর্ণালি নীরব উল্লাসে মেতে উঠো তুমি ;
বহুদূর চূড়া হতে অপলক অবাক চোখে চেয়ে থাকি আমি।

নন্দিতা, তোমার সেই চড়াই উতরাই পেরিয়ে
কাব্যিক ছন্দে চলা পথ ধরে
আমি আবারও যাব চলে
সেই অনন্ত লাবণ্যে মোড়া
লাল পেড়ে আঁচলের ফাঁকে লালিমা সুন্দরী ভেনাস
আর মহুল-মাধুরীর নেশায়।

# এক বুড়ো ষাঁড় এবং তার সাগরেদের আখ্যান

ফিরোজ অনীক

রাজ-দন্ত নিভে গেছে
তবু কঞ্চি তো
আছে সঞ্চিত
রয়েছে লকলকে জিব খান
অনাহারী মিসকিন বসে আছে যেন বা
পথ পানে চেয়ে রয় লুম্পেন
ক্ষোভে ফুঁসে কখনো সে
গর গর রাগে কাঁপে
ফের কাঁদে ফুঁপিয়ে

আর এক বুড়ো ষাঁড়
লুম্পেন সর্দার
হাহুতাশ করে কয়
'কী দিন ছিল হায় ' -
দাঁতের লহুর স্বাদ
ভোলা কি যায় আস্বাদ
চোখ জ্বলে
মন পড়ে
ঝাঁপতাল বৃষ্টির
ঝাপসা দৃষ্টি আরো ঝাপসা

সাল মাস দিন গুনে
একসা
উদাসী মন হয় ফ্যাকশা
ভাদ্রের রোদ নেই তপ্ত
তবু বৃষ্টি দিন অভিশপ্ত
মরমে মরে শুধু বাঁচতে
মন পোড়ে প্রতিশোধে মাততে
চেতনা অতলে জং লাগা কাস্তে

তোমারই প্রতিক্রিয়া মন্ত্রে
জন্মানো লুম্পেন
ভরে গেছে অস্ত্রে
আঙিনা উঠোন বারান্দা
সব ঠাঁই তন্ত্রে

চিলে কোঠায় বসে শূন্য দৃষ্টি
কানাকড়িহীন পকেটে শুধুই অনাসৃষ্টি
অদৃশ্য ধ্বজা খুঁটি বেড়াজালে বন্দি
আধিপত্যকামীর সনাতন ফন্দি

ষাঁড় আর বাছুরের আঁধারের যাত্রায়
সেদিনই তো ভোরের আলোর মাত্রায়
ক্ষেপে গিয়ে দড়ি ছিঁড়ে লাফানো
যেন লাল দেখে ষন্ডের ঝাঁপানো

অসুর সঙ্গী যত
আধ-মরা ঢোড়া বোড়া গোখরো
সইতে পারেনা না তার বিষ ক্ষত
পিতৃহীন লুম্পেনী স্মৃতি সব
ব্ল্যাকমেল করা ম্যানিফেস্টোর দিন গেছে অস্ত
বিস্মৃত হয় সে আস্ত

অভ্যেসে মাতে আলোর বিপরীতে
আঁধারের তাস-পাশা চলে ঘুপছির কানাগলিতে

রাস্তা হারানো প্রেতাত্মার
আর্তনাদে
রুদ্ধ কান্নারা মাতে প্রতিশোধে
প্রেম-পরশ বিহীন উষর রাতে

তবু—
আলোর যাত্রী চলে পথে
আমিত্ব সংগ্রামের সাথে।

## অথ এনারকিস্ট কথা
**ফিরোজ অনীক**

তুমি বলেছিলে
এসব 'ভেগ'
মিথ
জুতসই না
কিছুই

রাজনীতি সে তো খারাপ
সমাজ পঙ্কিল
স-অ-অ-অ-ব খারাপ

চাঁদে গ্রহণ লেগে
হাভাতে পাড়ার
সর্বহারা সাজ নিয়েই
থাকো তুমি—
'ব্যতিক্রমী'
ঘোলাটে চোখে
তুমি একটা
'চোখে আঙ্গুল দাদা'
সিনিক

মিথ - অমিথ,
বস্তু-অবস্তু গুলিয়ে দিতে
তোমার তো ঝুড়ি নেই কোনো
কার সেবায় মেতে তুমি
জানতে অ-জানতে?

সবাই বোঝে
মাঝ বয়সী ভীমরতিতে
এ রক্ষ-সেবা

সরল পথ নির্মাণ তো
জটিল পথ অতিক্রমেই
এটাও বুঝি মিথ?
তুমি তো জ্ঞান পাপ গায়ে
মেখে কূপমণ্ডূকতার অন্ধত্বে মাতো
জ্ঞান গ্রন্থে অথবা গোটা জীবন বিধানে
খোঁজ তথ্য
উদারতা প্রগতিশীলতার ময়দানে
পাক্কা খেলোয়াড় তুমি
ইতিহাস বোঝ না

তবু দাও নিদান অনায়াস

তুরীয় ভাব মেখে আল-খাল্লায়
অন্ধের হাতি দর্শনের লোভে
চোরামির চোরাবালিতে ডুবে থাকো
প্রেমহীন,
বস্তুদ্রষ্টাকে কর লুম্পেনি বিদ্রূপ

ইতিহাস নেপথ্যে হাসে
সৃষ্টির পথ ধরে,
তুমি থাক
তোমার আত্ম-কণ্ডূয়নে।

## কুফরি
**বরুণ শ্যেন**

মনুষ্যত্ব আছে!
যদি না থাকে, মনে মনে
তুমিও লাশের উপর জাম্প করতে পারো!
ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধত্বে, বিকট উল্লাসে
নোনা জলে যখন খুশি স্নান করতে পারো!

তবে... মনে রাখ বা নাই রাখ
রাক্ষসের রক্ত নেশা, সূচালো নখের আঁচড়ে
লাশের মতই তুমিও, পরজীবির কবলে—
চতুর্থ স্তম্ভের চাতুর্যে, স্লোপয়জন কলিজায়,
কুফরি মনে বাউন্ডারি এঁকে নিয়ে
জয়ধ্বনি তোলো প্রাণের প্রয়াণে!

# ভাঙো শৃঙ্খল

পিয়ারুল ইসলাম

কে হে তুমি? কোথা থেকে এলে?
তোমার অস্থি মজ্জার মাটি  পাথুরে এঁটেল না বেলে?
তোমার  শিরদাঁড়া বেচে  দিয়েছে
আলু পটলের দামে।
বিনিময়ে  কী পেলে?
আমারে বল  ভুলে  যেতে  সংগ্রামী মন্ত্র
কিসের দোহাই-এ? রক্তের!
না কেচ্ছা শোনাবে আমায় কোনো পৌঢ় ভক্তের?
সে ভক্তি গীতি
তোমার  কাছেই  থাক
আমি  পেরিয়ে  যেতে চাই প্রতি বাঁক।

শৃঙ্খল ভাঙতে
মানুষ কতো কাট-খড় পোড়ায়,
গাদা-গাদা বই পড়ে....
আর যুক্তি খোজে
পাহাড় -নদি, বন- জঙ্গল, চায়ের দোকান  ও
আধিপত্যের প্রতিটি মোড়ে!

হোক  বোধোদয়....
আধিপত্যের দরজায়  মারো লাথি,
বের কর নিজেকে, নতুন সূর্যের হোক উদয়!

# রাজা-মন্ত্রী, প্রজা এবং...

ভাস্বর রুজ

ক' টা শরীরের উপর গাড়িটা চলে যায়।
না না, গাড়িটা চালানো হয়!
পিষে যায় মানুষ ক' টা।
মানুষ নয়,
দেশের অখণ্ডতা, মূল্যবোধ।

ক' টা দেহ নিথর হয়,
না, দেহ নয়, ক' টা মানবদেহ নিথর হয়।
কে চালালো গাড়িটা?
শোনা যায়...
মন্ত্রীর ছেলে,
দাপটে চলে যায়।

না না, মন্ত্রীর ছেলে নয়, একটি অ-মানুষ
অনেক অ-মানুষ,
সরীসৃপের মত ফণা তোলে

এরপর ঘাত- প্রতিঘাত,
আরও মৃত্যু
দেশের সত্তা খণ্ড হয়।

হায়েনারা দলে দলে যায়।
পিছু পিছু শব হাঁটে
উদবাহু নাচে
খোশামোদে আহ্লাদে
দেশ মাতে!

# এই অতিমারী অন্ধকারে

## মানিক জ্যোতি দাস

এখন প্রশ্বাসে ভীষণ বিষ, ভীষণ বিষ ঘামে, লালায়,পোশাকে -পরিচ্ছদে। মুখে কাপড় সেঁটে আজ পথ হাঁটে জীবন গভীর সংশয়ে পরিমাপ করে - পারস্পরিক দুরত্ব আরকত বেশি হলে নিরাপদে ঘরে ফেরা যায়, সামাজিক দূরত্ব আর কত বেশি হলে নিকট প্রতিবেশী শেষ পরিচয়টুকু মুছে ফেলে।

এখন স্যানিটাইজারের বোতলে নজরবন্দী জীবন
ঘোরতর সন্দেহে বাঁচে নিতান্ত অবসাদে, প্রতিদিন
নিজের নিঃশ্বাসেই ভয়।

এখন চতুর্দিক থেকে ছুটে আসে লাশের মিছিল
শ্মশান-গোরস্থানের বুকে আতঙ্ক তোলে। কতশত লাশ
একটু মাটি কিংবা আগুনের জন্য হাপিত্যেশ শুয়ে থাকে
ঘরের আঙিনায়, পথে ঘাটে।
লাশ শুধু বিষে নয়, অনাহারে পরিযায়ী হেঁটে আসে
শত শত মাইলের পথ।
হায়রে বিষকন্যা সভ্যতা,নিজস্ব চোরা থলিতে কালেকালে কালনাগিনী জমিয়েছো যে বিষ তারই ছোবলে নীল তোমার লখিন্দর।
এতসব তবু কিছু বেহুলা মানুষেরা আজও একাকী ভেলা ভাসায় মানবিক খাতে,
জীবনকে ফিরিয়ে দিতে জীবনের হাতে
নির্ভয় হাল ধরে দৃঢ় প্রত্যয়ে।
এই অতিমারী অন্ধকার পার হবে বলে এখনও একাকী কিছু প্রশস্থ মানুষ

কাঠে কাঠ ঘষে,
কাঠে কাঠ ঘষে।

# ভালোবাসার টানে

## মীর সাহেব হক

দিগন্ত রেখা ছুঁতে গেলে
পথের মাঝে ক্লান্তির মৃত্যু ডেকো না।
সেখানে ছুটে গেলে পাবে
দেশের ভেতর আনন্দের দেশ
যার কোনো মৃত্যু নেই।
সেখানে গেলে পাবে
ভালোবাসার অস্পর্শ চুম্বন
যা তোমাকে বিজয়ী করতে পারে।
নাভীপথ বেয়ে
তোমার বুকে ফেলে আসা কপালের ঘাম
চূড়ায় বসে স্যাত করেছে ভালোবাসার মেঘ
যাকে আর স্বপ্ন বলতে পারি না।

তপোবনের চূড়ায় লাল শাড়ির ছায়ায়
হৃদয় রেখা বরাবর ফেলে দেওয়া
লুকিয়ে রাখতে পারিনি আমার সম্ভ্রম।
রুদ্ধশ্বাস পাহাড়ের চূড়া ফেলে
রাবণের অন্ধকার গুহার ভেতর পেয়েছি
তার প্রতিশ্রুতির ছাপ।
জানি,সব নদিপথেরই বাঁক আছে
তবু সুপ্ত ভাবে বয়ে যায় চিরকাল।

পাহাড়ের কাছে যেতে
ঝর্নার কাছে যেতে
সাগরের কাছে যেতে
তোমার ভালোবাসার আকাশটাকেও জুড়ে নিও।

পুনঃপাঠ

# ভাব ও কাজ

## কাজী নজরুল ইসলাম

ভাব আর কাজে সম্বন্ধটা খুব নিকট বোধ হইলেও আদতে এ-জিনিস দুইটায় কিন্তু আসমান-জমিন তফাৎ।

ভাব জিনিসটা হইতেছে পুষ্পবিহীন সৌরভের মত, একটা অবাস্তব উচ্ছাস মাত্র। তাই বলিয়া কাজ মানে যে সৌরভবিহীন পুষ্প, ইহা যেন কেহ মনে করিয়া না বসেন। কাজ জিনিসটাই ভাবকে রূপ দেয়, ইহা সম্পূর্ণভাবে বাস্তজগতের।

তাই বলিয়া ভাবকে যে আমরা মন্দ বলিতেছি বা নিন্দা করিতেছি, তাহা নহে ; ভাব জিনিসটা খুবই ভালো। মানুষকে কজায় আনিবার জন্য তাহার সর্বাপেক্ষা কোমল জায়গায় ছোঁওয়া দিয়া তাহাকে মাতাইয়া না তুলিতে পারিলে তাহার দ্বারা কোন কাজ করানো যায় না, বিশেষ করিয়া আমাদের এই ভাব-পাগলা দেশে। কিন্তু শুধু ভাব লইয়াই থাকিব, লোককে শুধু কথায় মাতাইয়া মশগুল করিয়াই রাখিব, এও একটা মস্ত বদ খেয়াল। এই 'ভাব'কে কার্যের দাসরূপে নিয়োগ করিতে না পারিলে ভাবের কোন সার্থকতায় থাকে না। তাহা ছাড়া ভাব দিয়া লোককে মাতাইয়া তুলিয়া যদি সেই সময় গরমা-গরম কার্যসিদ্ধি করাইয়া লওয়া না হয়, তাহা হইলে পরে সে ভাবাবেশ কর্পূরের মত উড়িয়া যায়। অবশ্য, এখানে কার্যসিদ্ধি মানে স্বার্থসিদ্ধি নয়। যিনি ভাবের বাঁশি বাজাইয়া জনসাধারণকে নাচাইবেন, তাঁহাকে নিঃস্বার্থ ত্যাগী ঋষি হইতে হইবে। তিনি লোকদিগের সূক্ষ্ম অনুভূতি বা ভাবকে জাগাইয়া তুলিবেন মানুষের কল্যাণের জন্য, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়। তাঁহাকে একটা খুব মহত্তর উদ্দেশ্য ও কল্যাণ-কামনা লইয়া ভাবের বন্যা বহাইতে হইবে, নতুবা বানভাসির পর পলিপড়ার মত সাধারণের সমস্ত উৎসাহ ও প্রাণ একেবারে কাদা-ঢাকা পড়িয়া যাইবে। এই জন্য কেহ কেহ বলেন যে, লোকের অনুভূতিতে ঘা দেওয়া পাপ। কেননা অনেক সময় অনুপযুক্ততা প্রযুক্ত ইহা হইতে সুফল না ফলিয়া কুফলই ফলে। আগে হইতে সমস্ত কার্যের বন্দোবস্ত করিয়া বা কার্যক্ষেত্র তৈয়ার রাখিয়া তবে লোকদিগকে সোনার কাঠির ছোঁওয়া দিয়া জাগাইয়া তুলিতে হইবে। নতুবা তাহারা যখন জাগিয়া দেখিবে যে, তাহারা অনর্থক জাগিয়াছে, কোনো কার্য করিবার নাই, তখন মহা বিরক্ত হইয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িবে এবং তখন আর জাগাইলেও জাগিবে না। কেননা, তখন যে তাহারা জাগিয়া ঘুমাইবে এবং জাগিয়া ঘুমাইলে তাহাকে কেহই তুলিতে পারে না। তাহা অপেক্ষা বরং কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভালো, সে-ঘুম ঢোল কাঁসি বাজাইয়া ভাঙানো বিচিত্র নয়।

এ-কথাটা যে একটা মস্ত সত্যি, তাহা এতদিনে আমরা ঠেকিয়া শিখিয়াছি। এই যে সেদিন একটা হুজুগে মাতিয়া হুড়হুড় করিয়া হাজার কতক স্কুল-কলেজের ছাত্রদল বাহির হইয়া আসিল, কই তাহারা তো তাহাদের এই সৎ সঙ্কল্প, এই মহৎ ত্যাগকে স্থায়ীরূপে বরণ করিয়া লইতে পারিল না। কেন এমন হইল? একটা সাময়িক উত্তেজনার মুখে এই ত্যাগের অভিনয় করিতে গিয়া 'স্পিরিট'কে কি বিশ্রি ভাবেই না মুখ ভ্যাঙচানো হইল। যাহারা শুধু ভাবের চোটে না বুঝিয়া না শুনিয়া শুধু একটু নামের জন্য বা বদনামের ভয়ে এমন করিয়া তাহাদের 'স্পিরিট' বা আত্মার শক্তির পবিত্রতা নষ্ট করিল, তাহারা কি দরকার পড়িলে আবার কাল এমনি করিয়া বাহির হইয়া আসিতে পারিবে? আজ যাহারা মুখে চাদর জড়াইয়া কল্যকার ত্যক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার মুখটি চুন করিয়া ঢুকিল, কাল দেশের সত্যিকার ডাক আসিলে তাহারা কি আর তাহাতে সাড়া দিতে পারিবে! হঠকারিতা করিয়া একবার যে ভোগটা ভুগিল বা ভ্রম করিল, তাহারই অনুশোচনাটা তাহারা কিছুতেই মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না --- বাহিরে যতই কেন লা-পরওয়া ভাব দেখাক না। এখন সত্যিকার ডাক শুনিয়া প্রাণ চাহিলেও সে লজ্জায় তাহাতে আসিয়া যোগদান করিতে পারিবে না। এইরূপে আমরা আমাদের দেশের প্রাণশক্তি এই তরুণদের 'স্পিরিট'টাকে কুব্যবহারে আনিয়া মঙ্গলের নামে দেশের মহা শত্রুতা সাধনই করিতেছি না কি? রাগিবার কথা নয়, এখন ইহা রীতিমত বিবেচনা-সাপেক্ষ। আমাদের এই আশা-ভরসাস্থল যুবকগণ এত দুর্বল হইল কিরূপে বা এমন কাপুরুষের মত ব্যবহারই বা করিল কেন? সে কি আমাদের দোষে নয়? সাপ লইয়া খেলা করিতে গেলে তাহাকে দস্তুর মত সাপুড়ে হওয়া চাই, শুধু একটু বাঁশি বাজাইতে পারিলেই চলিবে না। আজ যদি সত্যিকার

কর্মী থাকিত দেশে, তাহা হইলে এমন সুবর্ণ সুযোগ মাঝ-মাঠে মারা যাইত না। ত্যাগী অনেক আছেন দেশে, কিন্তু কর্মীর অভাবে বা তথাকথিত কর্মী নামে অভিহিত লোকদের সত্য-সাধনার অভাবে তাঁহারা কোন ভাল কাজে আর কোন অর্থ দিতে চাহেন না, বা অন্য কোনরূপ ত্যাগ স্বীকার করিতেও রাজী নন। কি করিয়া হইবেন? তাঁহারা তাঁহাদের চোখের সামনে দেখিতেছেন যে, কত লোকের কত মাথার ঘাম পায়ে ফেলার ধন দেশের নামে, কল্যাণের নামে আদায় করিয়া বাজে লোকে নিজেদের উদর পূর্ণ করিতেছে। যাঁহারা সত্যিকার দেশকর্মী -- সে বেচারারা সত্যি কথা স্পষ্টভাবে বলিতে গিয়া এইসব কর্মীদের কারচুপিতে পুয়ালচাপা পড়িয়া গিয়াছে। বেচারার এখন ভালো বলিতে গেলেও এইসব মুখোশ-পরা ত্যাগী মহাপুরুষগণ হট্টগোল বাধাইয়া লোককে সম্পূর্ণ উল্টা বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে একদম খেলো, ঝুটা ইত্যাদি প্রমাণ করিয়া দেন। সহজ জনসাধারণের সরল মন এসব না ধরিতে পারার দরুন তাহাদের মন অতি অল্পেই ঐ সত্যিকার কর্মীদের বিরুদ্ধে বিষাইয়া উঠে। 'দশচক্রে ভগবান ভূত ' কথাটা মস্ত সত্যি কথা।

তাহা হইলে এখন উপায় কি? এক সহজ উপায় এই যে, এখন হইতে জনসাধারণের বা শিক্ষিত কেন্দ্রের উচিত, ভাবের আবেগে অতিমাত্রায় বিহবল হইয়া কাণ্ডাকাণ্ড ভালোমন্দ জ্ঞান হারাইয়া না ফেলা। ভাব জিনিসটা মদের নেশার চেয়েও গাঢ়। পাড়-মাতালরা বলে, ' মদ খাও, কিন্তু তোমায় যেন মদে না খায়।, আমরাও বলিব, ভাবের সুরা পান কর ভাই, কিন্তু জ্ঞান হারাইও না। অন্ধের মত কিছু না বুঝিয়া, না শুনিয়া ভেড়ার মতো পেছন ধরিয়া চলিও না। নিজের বুদ্ধি, নিজের কর্মশক্তিকে জাগাইয়া তোল। তোমার এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রই দেশকে উন্নতির দিকে, মুক্তির দিকে আগাইয়া লইয়া যাইবে। এসব জিনিস ভাব-আবিষ্ট হইয়া চক্ষু বুজিয়া হয় না। কোমর বাঁধিয়া কার্যে নামিয়া পড়িতে হইবে, ইহার ফল কি। শুধু হোড়ের মত বা উদমো ষাড়ের মত দেওয়ালের সঙ্গে গা ঘেঁসড়াইয়া নিজের চামড়া তুলিয়া ফেলা হয় মাত্র। দেওয়াল প্রভু কিন্তু দিব্যি দাঁড়াইয়া থাকেন। তোমার বন্ধন ওই সামনের দেওয়ালকে ভাঙ্গিতে হইলে একেবারে তাহার ভিত্তিমূলে শাবল মারিতে হইবে।

আবার বলিতেছি, আর ভাবের ঘরে চুরি করিও না। আগে ভালো করিয়া চোখ মেলিয়া দেখ। কার্যের সম্ভাবনা-অসম্ভাবনার কথা অগ্রে বিবেচনা করিয়া পরে কার্যে নামিলে তোমার উৎসাহ অনর্থক নষ্ট হইবে না। মনে রাখিও, তোমার 'স্পিরিট' বা আত্মার শক্তিকে অন্যের প্ররোচনায় নষ্ট করিতে তোমার কোন অধিকার নাই। তাই পাপ-- মহাপাপ!

(বানান অপরিবর্তিত)।

Space Donated By A Well Wisher